দিনে লাগিল। কিন্তু দেখিলাম—সেই বৃদ্ধের শরীরে তখনও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত অযুত হস্তীর বল! সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া, দ্বার ঠেলিয়া, ব্রাহ্মণ গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আমরা চাহিয়া দেখিলাম,—ব্রাহ্মণের পিছনে-পিছনে ধীরে অথচ অচল মহিমাভরে—এক শুভ্র-বসনা-বিধবাও প্রবেশ করিল। তাহার কোলে গোধূলির প্রথম তারাটীর মত—রূপে উজ্জ্বল ও রোগে ম্লান—একটী ৫ বৎসরের কন্যা!

বিধবা—যুবতী। তাহার লজ্জা-ললিত-মলিন মুখ হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছিল, অর্ক-ময়ুখ-তাপে-অবসন্ন-ললাট-দেশ হইতে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তাফলের মত গণ্ডযুগলে গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে কোনও কথা না কহিলেও, তাহার নিরাশা-কাতর-মুখখানি—অব্যক্ত মধুর চক্ষের ভাষায়, একটু স্থান পাইবার জন্য যেন সকলের কাছেই মিনতি করিল। সে আর্ত্ত নীরব-নিবেদন যেন নিয়তির অলঙ্ঘ্য আদেশের মতই কঠোর মনে হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের প্রমাদে—যাহারা ব্রাহ্মণকে বসিবার স্থান দিনে স্বীকৃত হয় নাই, যুবতীর নির্ব্বাক্ মুখের কমনীয়তায় তাহাদের সুপ্ত হৃদয় লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্বের তীব্র-কশাঘাতে সহসা সচেতন হইয়া উঠিল। দুই চারি জন যাত্রী আপনা হইতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ব্রাহ্মণ ও যুবতীকে বসিবার স্থান করিয়া দিল। বেঞ্চের এক পার্শ্বে, বহু অপরিচিতের ব্যগ্র-কৌতূহলী সেই দৃষ্টির সম্মুখে—দেহমনে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া, শ্রান্ত-রমণী বসিয়া পড়িল, তাহার পর, অন্তরের কোষবদ্ধ মাতৃত্বটুকু বর্ণে গন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়া, নিজের অঙ্কেই বালিকার জন্য নিরাপদ নীড় রচনা করিল। শোষ, রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে পলকহীন নতনেত্রে চাহিয়া বালিকার জীর্ণ বক্ষ পঞ্জরে সেবা-নিপুণ শীতল হাত খানি বুলাইয়া দিতে লাগিল।

এইবার ব্রাহ্মণের সঙ্গে কেহ কেহ আলাপ আরম্ভ করিলেন।

মায়ের কোলে শুইয়া, প্রতিপদের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার ন্যায়, মেয়েটী, অল্পক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ সেই সুবৃহৎ পুঁটলিটী খুলিয়া ফেলিলেন এবং এক খানি পাঁউরুটী বাহির করিয়া তাহারই কিয়দংশ বালিকার হাতে দিলেন, কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সে তাহা চিবাইতে লাগিল।

এই দুঃসহ গ্রীষ্মেও শার্টের উপর 'কোট-ওয়েষ্ট কোট' আঁটিয়া "লম্বসাট পটাবৃত" এক ভদ্র লোক ব্রাহ্মণের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেয়ে-টীর কি অসুখ?" উত্তর হইল,—"পেটের ব্যারাম"। আবার প্রশ্ন হইল,—পেটের অসুখে পাঁউরুটী খাইতে দিতেছেন কেন?" উত্তর—"কি করিব?—কবিরাজ মহাশয় খাইতে বলিয়াছেন।" প্রশ্ন—"তিনি কি রকম কবিরাজ?" উত্তর—"ভাল বলিয়াই বোধ হয়। কলিকাতায় নাম-ডাক যথেষ্ট। এই দেখুন না, আমার এই দৌহিত্রীটি প্রায় সাত মাস ভুগিতেছিল, আমাদের দেশের সমস্ত ডাক্তারকে দেখান হইয়াছিল, কেহই স্থায়ী উপকার দেখা-ইতে পারেন নাই। শেষে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, একটু জল বার্লিও হজম করিতে পারিত না। তখন কবিরাজ দেখাইবার ব্যবস্থা হইল। সেই অবস্থায় ইহাকে কলি-

কাতায় আনিলাম। কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইলাম।তাঁহার ঔষধ এক মাস খাইতেছে, পেটের অসুখ ভাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন এই এক দায় দাঁড়াইয়াছে—মেয়েটীর ভাত সহ্য হইতেছে না। উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন ভাত দিলেই সর্দ্দী হইয়া জ্বর ফুটে। সেই জন্য আজ সকালে ইহাকে কলিকাতায় আনিয়া-ছিলাম। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া বলিলেন, —"১০।১৫ দিন ভাত না দিয়া পাঁউরুটী খাইতে দিবেন।" আমাদের দেশে প্রত্যহ "রুটওয়ালা" আসেনা, তাই ২।৪ খানা ভাল রুটী কলিকাতা হইতে কিনিয়া লইয়াছি।" ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইলেন। প্রশ্নকর্ত্তা-ভদ্রলোকটী ঈষৎ হাসিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া, জনান্তিকে বলিলেন,—"ব্যাপার বুঝুন মহাশয়! আজকাল কবিরাজরাও পাঁউরুটী পথ্য দেন!" আমার বন্ধু বলিলেন—"তাহাতে আর দোষ কি? ডাক্তাররাও ত মাছের ঝোল, পলতার ডাল্না পথ্য দেন, কবিরাজ না হয় পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।" ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"ইহাতে দোষ আছে বৈকি! যিনি শাস্ত্রজ্ঞ-কবিরাজ, তিনি বিদেশী পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন কেন? পাঁউরুটী মুসলমানের আম-দানি, এদেশের খাদ্য নহে। পাঁউরুটীর দোষ-গুণ কবিরাজ কি বুঝিবেন? তবে আজ কাল দেশে অনেক পেটেণ্ট ঔষধ-বিক্রেতা-কবিরাজ বলিয়া পরিচিত, তাহারা "জ্বরান্তকচুর্ণ" নাম দিয়া গোপনে রং মিশ্রিত কুইনাইন্ চালায়, তাহারাই প্রকাশ্যে পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করিতে পারে।"

মর্ম্মান্তিক শ্লেষ! কিন্তু সহজ সারল্যে অকুণ্ঠিত!! এ কথার আর কি প্রতিবাদ করিব? এযে সাংঘাতিক সত্য! বাস্তবিক, বিদেশীকে স্বদেশী করিয়া লইবার উদ্যোগ—বৈদ্য সমাজে ত দেখিতে পাই না! সে উদা-রতা ছিল—ভাব মিশ্রের; সেই আত্ম-সমাহিত মনস্বী চিকিৎসক, জন-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া 'কফি' 'তোপচিনী'কেও স্ব-গ্রন্থে সগৌ-রবে স্থান দিয়াছিলেন! সে ত্রিকালের কারু-ণিক গুণগ্রাহী-বৈদ্য এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় কি? আয়ুর্ব্বেদের অভাব অপূর্ণ-তার কথা, ত্যাগশীল-তপস্বীর মত কেহ ভাবিয়া দেখেন কি?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। "অগ্নিময় রক্তচক্ষু" মেলিয়া, বাষ্পময় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, বিরাট দেহ "লৌহ সরীসৃপ" ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই ভদ্রলোকের কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম—সত্যই কি পাঁউরুটী এদেশের খাদ্য নহে? যে দেশের ভগবান ভোগের জন্যই, "এক" হইয়াও "বহু" হইয়া-ছেন—সে দেশে কি ভোগের জিনিষের কখনও অপ্রতুল ছিল?

সেই দিন হইতেই—অতীতকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। সেই দিন হইতেই, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা আমার হীন-জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসে একটা যুগ সৃষ্টিকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে! সেই দিন হইতেই—শ্মশানের অঙ্গার ঘাঁটিয়া, চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, শব-চুল্লীর অর্দ্ধদগ্ধ বংশ খণ্ড বাছিয়া ভবিষ্যতের জন্য সম্বল সংগ্রহ করিতেছি। একটা অনাগত আনন্দের নবীন আলোক রশ্মি, আমার বিগ্রহ-বিহীন-অন্ধকার-মর্ম্ম-মন্দিরে আরতির "পঞ্চ-প্রদীপ" জ্বালিয়া দিয়াছে। সেই পুলকের উন্মাদনায় মনীষী-চিত্তরঞ্জনের মধুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিয়া, স্বর্ণমণ্ডিত অতীতের পানে

চাহিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—"এদেশে নাই কি ? ছিল না কি ?"

এদেশে পাঁউরুটীও ছিল। আয়ুর্ব্বেদের পাঠকগণের কাছে আজ আমি তাহারই একটু পরিচয় দিব।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে "কন্দুপক্ক" নামক একপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "কন্দুপক্ক" শব্দটী যৌগিক,—অর্থাৎ দুইটী শব্দের যোগে নিষ্পন্ন,—ইহার অর্থ কন্দুতে যাহা পক্ক। কিন্তু শাস্ত্রে নানা জনে 'কন্দুর' নানা অর্থ করিয়াছেন, ফলে "কন্দু" চেনা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রথমেই আমাদিগকে "কন্দুর" প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে, কেননা 'কন্দু' না বুঝিলে "কন্দুপক্ক"ও বুঝা যাইবে না।

প্রসিদ্ধ অভিধান কর্ত্তা—নব রত্নের অন্যতম রত্ন অমর সিংহ—"কন্দুর" পর্য্যায়ে ৪টী শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যথা—

ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রোনা কন্দুর্বা
স্বেদনী স্ত্রিয়াং।

অমরোক্ত শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, "অম্বরীষ" "ভ্রাষ্ট্র" "কন্দু" ও "স্বেদনী"—এই চারিটী শব্দ সমানার্থক। কিন্তু কারিকার টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত "অম্বরীষ" ও "ভ্রাষ্ট্র" শব্দকে ভর্জ্জন পাত্রের সংজ্ঞা রূপে ব্যবহার করিয়া, "কন্দু" ও "স্বেদনী" এই উভয় শব্দকে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভানুজীর সূত্র—

স্কন্দে 'স' লোপশ্চ উঃ।১।১৫ অর্থাৎ শোষণার্থ 'স্কন্দ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উ' প্রত্যয় করিয়া কন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবার 'স্বিদ' ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে লুট্ প্রত্যয় করিয়া "স্বেদন" শব্দ, এবং তাহাই স্ত্রীলিঙ্গে "স্বেদনী" রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। "স্বেদনী"র অর্থ স্বেদ করা হয় যাহাতে, 'কন্দুর' অর্থ ও শোষণ করা হয় যাহাতে, অতএব ভানুজীর মতে "কন্দু" ও "স্বেদনী" অভিন্ন। উভয়েরই এক অর্থ; ভানুজী 'কন্দু' ও "স্বেদনী"কে মদ্য নির্ম্মাণোপযোগী পাত্রবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে আচার্য্য হেমচন্দ্র "ভক্ষকার" ও "কান্দবিক" এই দুইটী নামকে এক পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া, 'কন্দু' ও 'স্বেদনিকা'কে এক অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। * অমর সিংহ "ভক্ষ্যকার ও" "কান্দবিকের" আর একটী নাম দিয়াছেন—"আপূপিক"। এই সকল শব্দ-যোজন ও সংজ্ঞা-রহস্য দেখিলে মনে হয়, সেকালে "ভক্ষ্য" বলিলে "কন্দুপক্ক" ও "অপূপ" [পিষ্টক] প্রভৃতি বুঝাইত।

এইবার আমরা "কান্দবিক" শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব। 'কন্দুতে সংস্কৃত' (সংস্কৃতং ভক্ষ্যাঃ।৪।২।১৬।) এই অর্থে "কন্দু" শব্দের উত্তর "অন্" প্রত্যয় হইয়া 'কান্দব'—এই রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। পরে 'কান্দব' যাহার 'পণ্য' [বিক্রেয়] এই অর্থে "কান্দব" শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় করিয়া "কান্দবিক" শব্দের উৎপত্তি। অমরসিংহ 'কান্দব' ও অপূপ'কে এক পর্য্যায় ভুক্ত করিলেও "কান্দব" ও অপূপ এক দ্রব্য নহে। 'অপূপ' শব্দে সাধারণ পিষ্টক বুঝায়, 'কান্দব' পিষ্টক জাতীয় হইলেও স্বতন্ত্র পদার্থ। বোধ হয় অমরসিংহ ইহা জানিতেন, নহিলে 'ঋচীষং পিষ্টপবনম্' লিখিয়া তিনি পিষ্টক পাক পাত্রের

* ভক্ষ্যকারঃ কান্দবিকঃ কন্দু স্বেদনিকে সমে। মর্ত্ত্য কাণ্ড।

নামকরণ করিতেন না। "অপূপ" [পিষ্টক] ও "কান্দবের" পাকপাত্র ও পাকপ্রণালী-সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "পিষ্টক"—সাক্ষাৎ অগ্নির সাহায্যে পাক করিতে হয়, 'কান্দব' পাকে সাক্ষাৎ অগ্নির আবশ্যক নাই—কেবল পাক করিবার পূর্ব্বে—অগ্নির সাহায্যে "কন্দুটী" গরম করিয়া লইতে হয়। "কন্দু" উত্তপ্ত হইয়া 'স্বেদের' উপযোগী হইলে—তন্মধ্যে "কান্দব" পূর্ণ করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। কন্দু—শোষকযন্ত্র বিশেষ, সুতরাং কন্দুতে যে দ্রব্য সংস্কৃত হইবে, সে দ্রব্য যে সাধারণ পিষ্টক হইতে স্বতন্ত্র—ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অমরসিংহ—উভয়ের এই ভেদটুকু অগ্রাহ্য করিয়াছেন, পাক-বিশারদ হেমচন্দ্র এ ভেদ ভাল রকমেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি "কান্দবিক" শব্দের পর্য্যায় হইতে অপূপিক শব্দটী ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস—এই "কন্দু"-পক্ক দ্রব্যই—পাঁউরুটী। "মালবিকাগ্নি মিত্র" নামক কালিদাস কৃত নাটক পড়িয়া আমাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন—পাঁউরুটী প্রস্তুতের স্বেদযন্ত্র "তন্দু"—দোকানের মধ্যেই অবস্থিত হইয়া থাকে। "মালবিকাগ্নি মিত্রের রাজা বিদূষককে অনুরোধ করিতেছেন—"কিং বহুনা সখে! চিন্তয়িত ব্যোঽস্মিতে।" সখা! আর অধিক বলিতে চাহিনা, আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু চিন্তা করিয়া দেখিও।" উত্তরে বিদূষক বলিতেছেন—ভবদাবি অহং দিঢ় বিপণে কন্দু বিতমে উদরাভ্যন্তরং দজ্‌ঝই।" "আপনাকেও আমার বিষয় ভাবিতে হইবে, কেননা, বিপণিস্থ "কন্দুর" ন্যায় আমার উদরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে।" ২য় অঙ্ক। এই উক্তি প্রত্যুক্তিতে বেশ বুঝা যায়,—সেকালেও দোকানের মধ্যে 'কন্দু'-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইত। কান্দবিক জলন্ত অঙ্গার পূর্ণ করিয়া কন্দুর অভ্যন্তর ভাগ উষ্ণ করিয়া লইতেন।

বর্ত্তমান কালে এক শ্রেণীর লোক রুটী বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে আমরা "রুটীওয়ালা" নামে অভিহিত করি। পুরাকালেও কান্দব বিক্রয়-কারীকে লোকে "কান্দবিক" বলিত। সচরাচর বৈশ্য জাতিই—কান্দব-বিক্রয়ের ব্যবসা করিতেন, বৈশ্যবর্ণ—দ্বিজাতি, সুতরাং তাহাদের প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে কাহারও আপত্তি ছিল না। স্মৃতিশাস্ত্র পড়িলে আমরা বুঝিতে পারি,—বৈশ্যগণের দেখাদেখি শূদ্রগণও একদা কান্দব বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। শূদ্রস্পৃষ্ট "কান্দব" ভক্ষণেও ব্রাহ্মণের কোন বাধা ছিল না। প্রমাণ—

কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥

এ প্রমাণ তিথিতত্ত্বের। "কূর্ম্ম পুরাণেও" এ প্রমাণ সমর্থিত হইয়াছে। প্রধান স্মার্ত্ত হারীত ও ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"কন্দুপক্কং স্নেহপক্কং পায়সং দধিশক্তবঃ।
এতানি শূদ্রান্নভুজো ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ॥"

একে কন্দুপক্ক, তাহাতে আবার মনুর দোহাই, এ লোভ সম্বরণ করা—দেবতারও অসাধ্য! ব্যবস্থাপক সুমন্ত্র এবং প্রায়শ্চিত্ত-কার শূলপাণিও শূদ্রগৃহজাত "কন্দুপক্ক"কে উপেক্ষা করিতে সাহসী হ'ন নাই।

এ যুগে রুটীর কারখানাতে শৌচাশৌচ

রক্ষিত হয় না। সেকালেও হইত না। শুদ্ধি-তত্ত্বে মহর্ষি শাতাতপ ও বলিয়াছেন—

গোকুলে "কন্দুশালায়াং" তৈলযন্ত্রেক্ষু যন্ত্রায়াঃ।
অমী মাংস্তানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥

মহর্ষি চরক জেন্তাক স্বেদ-প্রসঙ্গে কন্দুর উল্লেখ করিয়াছেন।

"দ্বি-পুরুষ প্রমাণং মৃন্ময়ং কন্দু সংস্থানম্"
সূত্র। ১৪ অঃ

এই সকল শাস্ত্র-বচনের মহিমায় আমরা "কন্দুপক্ক"কে পাঁউরুটী ও বিস্কুট বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। আর্য্যযুগে যে পাঁউরুটীর প্রচলন ছিল, পাঁউরুটী প্রস্তুতের জন্য যে স্বতন্ত্র শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কালের লোকে যে বহুল পরিমাণে পাঁউরুটী ব্যবহার করিতেন, উণাদিসূত্র, স্মৃতি শাস্ত্র, পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কালের অনতিক্রমণীয় বিধান বলে—প্রাচীন "কন্দু" "তন্দূ" নামে অপভ্রংশ ও পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের জিনিষই আজ আমাদের কাছে বিদেশী আগন্তুকরূপে, দেখা দিয়াছে, আর্য্যযুগের "কান্দব" আজ "পাঁউরুটী" "বিস্কুট" নামে অনার্য্য জুষ্ট অভিধান গ্রহণ করিয়াছে!

"তত্ত্ববোধিনীর টীকাকার হইতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পর্য্যন্ত—সকলেই "কন্দু" ও "কন্দুপক্ক" লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কন্দুকে "ভর্জ্জন পাত্র" কেহ "মণ্ড-পাক যন্ত্র", কেহ "ভোগস্থান" কেহবা "করাহী" নামে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু কন্দুপক্ক যে পাঁউরুটী—'বৃন্দ সংহিতা'র কৃতান্নবর্গ হইতে আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি।

"বৃন্দ" একজন প্রবীন বৈদ্য ছিলেন, তিনি চক্রপাণি ও ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। "চক্রদত্ত" ও "ভাব প্রকাশে—"বৃন্দ-ধৃত বহুযোগ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং 'বৃন্দকে" অর্ব্বাচীন বলা চলেনা। 'বৃন্দে'র সময়ে "কন্দুপক্ক" একটী উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। যথা—

বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং লবণান্বিতাং।
বিনীয় সন্ধানং কিঞ্চিৎ স্থাপয়েদ্ভাজনে নবে।
চণ্ডাতপে তাবদ্রক্ষেৎ যাবদম্লত্ব মাপ্নুয়াৎ।
উদ্ধৃত্য চ পুনঃ পশ্চাৎ সম্নায়ৎ দৃঢ় পাণি না॥
ততোঽপূপা কৃতি কুর্য্যাৎ খজমূর্চ্ছিতয়া তয়া।
ভূর্যাঙ্গার প্রতপ্তেতু কন্দুগর্ভে নিবেশ্য চ॥
পক্কেন রক্ষমালিপ্য স্বেদায়ত্তাং যথাবিধি।
অনেন বিধিনা সিদ্ধং কান্দবং কথিতঃ বুধৈঃ॥
কান্দবং মলকৃদ্বৃষ্যং ত্রিষু দোষেষু পূজিতং।
সদ্যোরুচি করং হৃদ্যং শীঘ্র মিন্দ্রিয় তর্পণং॥
দুষ্টে, মাংসরসেঃ বাপি কান্দবং ভক্ষয়েন্নরঃ।
শ্বাস-কাস-জরচ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহং॥

'বৃন্দ'। কৃতান্নবর্গ। (১)
দ্রব্য বিজ্ঞানীয়-কাণ্ড।

ইহার অর্থ—

ময়দার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া, জল দিয়া বেশ নরম ভাবে মাখিবে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্ধান [মণ্ড জাতীয় অম্ল রসাত্মব দ্রব বিশেষ] নিক্ষেপ করিয়া নূতন মৃন্ময়-পাত্রে রাখিয়া দিবে। ঐ পাত্র রৌদ্রে থাকিবে, যখন দেখিবে, পাত্রস্থ ময়দা অম্লরসযুক্ত হইয়াছে, তখন ভাঁড় হইতে তাহাকে বাহির করিয়া খুব দৃঢ় হস্তে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। উত্তমরূপ ছানিত হইলে, তাহার দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। পরে "কন্দু নামক পাক

(১) 'বৃন্দে'র অনুকরণ করিয়া ভাবমিশ্র স্বগ্রন্থে "কৃতান্নবর্গ" সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যন্ত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রজ্বলিত অঙ্গার পূর্ণ করিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। সেই উষ্ণ কন্দুর মধ্যে পিষ্টকগুলি রাখিয়া, কন্দুর ছিদ্র পথ পঙ্কদ্বারা লেপন করিয়া দিবে। এই রূপ উপায়ে সিদ্ধ পিষ্টকের নাম "কান্দব"। দুগ্ধ অথবা মাংস রসের সহিত ইহা ভক্ষণ করিতে হয়।

কান্দবের গুণ—মল-বৃদ্ধিকারক, শুক্রজনক, ত্রিদোষ-নাশক, সদ্যোরুচিবর্দ্ধক, হৃদয়ের তৃপ্তিসাধক, ইন্দ্রিয় তর্পণ [ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা সম্পাদক] এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগ নাশক।

এই কান্দবই যে পাঁউরুটী—এখন বোধ হয় কেহই আর তাহা অস্বীকার করিবেননা। বর্ত্তমানকালে যেরূপ ভাবে পাঁউরুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে, পুরাকালে "কান্দব" ও সেইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইত।

এখন আমরা "কন্দু" ও "কান্দব" চিনিতে পারিলাম। ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ, যে "কন্দুর" স্বরূপ বুঝাইতে পারে নাই, আয়ুর্ব্বেদের মহিমায় আমরা সেই 'কন্দুর' প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইলাম। আয়ুর্ব্বেদের প্রসাদে—আমাদের মনের সন্দেহ সংশয় প্রশ্নের অতীত হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই পত্র-"সূচনায়" বলিয়াছিলাম, আমাদের এমন কোনও শিল্প-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-নীতি নাই, আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে যাহার না উন্নতি হইবে। আয়ুর্ব্বেদকে অপূর্ণতা হইতে রক্ষা করিতে পারিলে—আমরা দেব-প্রতিষ্ঠার ফল ভাগী হইব। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—আমার ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্ত নিবেদন অরণ্যের "রোদনের মত নিষ্ফল হইয়াছে। নহিলে, অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়ের পবিত্র- প্রাঙ্গণে—এতদিন "গণনাথ" যোগীন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রনাথকে আমাদের সহযোগী-সাধক বেশে দেখিতে পাইতাম।

আমাদের শ্লাঘার, স্পর্দ্ধার, গর্ব্বের—যাহা কিছু আছে, তাহা যে সূর্য্যাস্তের বর্ণ-রেখার মত ধীরে ধীরে দিক্ চক্রবালে মিলাইয়া যাইতেছে! কীর্ত্তি-গরীয়ান-ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সে দিকে কি তোমরা ফিরিয়াও চাহিবে না?

আমার আয়ুর্ব্বেদ! আমার বিরাট অতীতের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি! আমার পার্থিব নন্দনের হরিচন্দন! আমার জাতীয় জীবনের দীপালি-উৎসব! আমার সারা সৃষ্টির কঠোর সাধন! আমার চরম সত্যের দিব্য জ্যোতিঃ! তুমিই বলিয়া দাও—কেমন করিয়া তোমায় রক্ষা করিব? সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা সাজিয়া—আমরা যে দলাদলির মোহে আপনার রক্ত আপনিই পান করিতেছি! *

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, "সাহিত্য" "মর্ম্মবাণী" "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি সাময়িক পত্রের লেখক, প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ অসাধারণ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ত তীর্থ মহাশয়ের "পাকবিদ্যা" হইতে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। "কন্দুপক"ই যে পাঁউরুটী—একথা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। তিনিই আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।
—লেখক।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সূত্র।

পদার্থবিদ্ পণ্ডিতগণের অভিমতে যতগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলই কার্য্য-কারণ সমষ্টি। অর্থাৎ-মহৎ-প্রকৃতি হইতে কীটানুর হৃদপিণ্ডজাত শোণিত পুঞ্জের সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত যত কিছু পদার্থ জ্ঞানের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে সমুদয়ই পরস্পর কারণ-মুখাপেক্ষী।

কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন,—গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রমালা শোভিত গগনমণ্ডল অসংখ্য জাতীয় অসংখ্য জীবগণের আধার বায়ুমণ্ডলের সহিত দেদীপ্যমান বসুন্ধরা ঐন্দ্রজালিকের বৈচিত্রের ন্যায় বিচিত্রতা দেখাইয়া অহর্নিশি প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়গণকে যথোচিত তৃপ্ত করিতেছে।

এই বিচিত্রতা কেবল কার্য্য-কারণ ভাবের বিকাশ মাত্র। প্রোক্ত মত পোষক বৈজ্ঞানিক আচার্য্যবৃন্দ এই সীমাশূন্য জগৎকে দুই ভাবে বিভক্ত করিয়া, একটী কারণ অপরটি কার্য্য এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে—যাহা এক সময়ে কার্য্য, তাহাই অপর সময়ে কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়? যেমন পিতা, পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি।

এই কার্য্য-কারণ যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি মহৎ-ও বিবিধ রাগে রঞ্জিত, জগৎব্যাপক; অতএব মহৎ; অনেক স্থানে অতি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, —অতএব সূক্ষ্ম। নানা বিচিত্র ভাবে প্রকটিত —সুতরাং বিবিধরাগে রঞ্জিত।

কত সহস্র সহস্র শতাব্দি অতীত হইয়াছে এ অদ্ভুত কার্য্য-কারণ ভাবের ইয়ত্তা হইতে পারে নাই,—পারিবেও না।

সভ্য জগতে যত প্রকার চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই কতকগুলি মূল নিয়মের নাম সূত্র বা Principle। উক্ত সূত্রের ভেদানুসারে চিকিৎসা এবং উহার নামের ভেদ হইয়া থাকে।

সূত্রই শাস্ত্রের জীবন এবং সূত্রই শাস্ত্রের সোপান। যে কোন বিদ্যাই হউক,—যতদিন সৌত্রিক আকারে উপস্থিত না হয়, সৌত্রিক পন্থায় সম্প্রসারিত না হয়, অথবা সৌত্রিক নিয়মের অধীন হইয়া না চলে, ততদিন উহার প্রকৃতশাস্ত্রে সংজ্ঞা বা (Scince) নাম দেওয়া সমীচীন নহে। সূত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে শাস্ত্রের উন্নতি বা অবনতি সর্ব্বতোভাবে বিচার্য্য।

শাস্ত্রের সূত্র অতি দুর্বোধ ও জটিল বলিয়া সহসা উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন হয় না। এই হেতুবাদ বশতই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানের যথার্থ উন্মেষ ও যথার্থ অনুশীলন না জন্মিলে সূত্রের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না।

অথর্ব্ব বেদে সূত্রের একটি সুন্দর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—,

"যোবিদ্যাৎ সূত্র বিততং"
যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ
সবিদ্যা ব্রাহ্মণং মহৎ॥

যদি ও এই সূত্রটি ব্রহ্ম বিধায়ক; ব্রহ্মপ্রতি

পাদনই এই সূত্রের উদ্দেশ্য, তথাপি ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহা মূল—যাহা হইতে সমুদয়ের সূচনা হইয়াছে—যাহা সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ—তাহাতে সমুদয়ই গ্রথিত, তাহা জ্ঞাত হওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে অনেকেই ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি পাঠ করিয়াই বৈদ্যকশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ বৈদ্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই সংগ্রহক বা তালিকা গ্রন্থপাঠী। শাস্ত্রে যে রোগে যে ঔষধ-তৈল-ঘৃতাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহারা তাহার অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবার যাহারা মূল (আর্ষ) গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন। তাঁহাদেরও শাস্ত্রের সূত্রাদির প্রতি দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়।

বৈদ্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ইহারা ব্যাকরণের কারক-সমাস প্রভৃতি এবং ন্যায়ের দুই চারিটা অবচ্ছেদাবচ্ছিন্ন লইয়াই প্রায়শঃ বৃথা কাল হরণ করেন। বৈদ্য শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে ইহাও একটি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই চিকিৎসা বিষয়ক নূতন সংকলন বা আবিষ্কার ও যথার্থ গভীর গবেষণা আর নাই। রোগী, রোগের প্রকৃতি, রোগ প্রতি কারক ঔষধ ও তত্তাবতের অংশাংশ কল্পনা,—দেশ-কাল ইত্যাদির চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত অল্প ব্যক্তিরই সংভ্রব দৃষ্টি-গোচর হয়। সুতরাং এক্ষিণ অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের আবার সূত্র কি! ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, যে, যুক্তির উপর শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, বিস্তীর্ণ বিষয় যাহা দ্বারা সুসম্বদ্ধ এবং যাহাতে প্রোথিত থাকে এবং অনুক্ত বিষয়ের ও যাহা দ্বারা উপলব্ধি হয় তাহাই সূত্র।

যেমন—দেব+আদি=দেবাদি। দয়া+অর্ণব=দয়ার্ণব। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংহিত পদ যাহার জানা আছে, তিনি সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পদেরই সন্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐরূপ উদাহরণ সমূহের সন্ধি যে নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, যাহার সেই নিয়মের পরিগ্রহ হইয়াছে, তিনি ঐরূপ অনন্ত পদের সন্ধি নিষ্পন্ন করিতে সর্ব্বথা সমর্থ।

ঐরূপ নিয়মের নামই সূত্র। সূক্ষ্মদর্শী চক্রপাণি বলিয়াছেন।—

"সূত্রনাৎ সূচনাচ্চার্থ সন্ততেঃ সূত্রম্।"

যাহার সূত্র যত ব্যাপক অব্যভিচারী; তাহার সূত্র তত পরিপক ও প্রশংসনীয়। সৌত্রিক লাক্ষণিক প্রথার সন্ধান না পাইলে মনুষ্য কোন বিষয়ই আয়ত্ত করিতে পারিত না।

সেই জন্যই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াছেন।—

ঋষযোঽপি পদার্থানাং
নান্তং যান্তি পৃথকৃতশঃ।
লক্ষনেনতু সিদ্ধানামন্তংযান্তি বিপশ্চিতঃ॥

কোনরূপ নিদর্শন ব্যতিরেকে শাস্ত্র মাত্রেরই সূত্র পরিস্ফুট ভাবে লক্ষীভূত হয়না। সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রের ও সূত্র একেবারে বিনা নিদর্শনে নির্ম্মিত হইয়াছে—ইহা সম্ভবপর নহে। কোন স্থানে কোন ঘটনা অগ্রে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টানুসারে অনুমান, অনুভব, যুক্তি—ইত্যাদির বলে সূত্র সকল উদ্ভাবিত হয়।

১। অন্নরন্ধন-স্থালীর উপররিস্থিত সরাবের উত্থান ও পতন অবলোকন করিয়া (জেমস্ ওয়াট) জলীয় বাষ্পের যে কার্য্য সাধিকা শক্তি অবধারণ করেন, তাহা হইতেই

এহিক্ষণ বৃহৎ অর্ণবয়ান, সুদীর্ঘশকটশ্রেণী, শত শত যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।

২। উদ্যানস্থিত য়্যাপেল ফলের পতন দেখিয়া সার আইযাক্ নিউটন পৃথিবীর যে আকর্ষণ অনুমান করেন, তাহা জগৎব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মূল সূত্র।

৩। স্নানার্থ জলাধারে অবগাহন কালে শরীরের লঘুতা অনুভব করিয়া, আর্ক মিডিশ্ জলাদিতে ভাসমান দ্রব্যের ভারাপচয়ের যে কারণ নিরূপণ করেন, তাহা হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়ক নিয়মের সূত্রপাত হয়।

৪। একদা ঝটিকা কালে ফ্রাঙ্কলিন্ ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ যে বিদ্যুতের অংশ ইহা অবগত হন্। পরে বিদ্যুৎ ও তাড়িৎ আবিষ্কৃত করেন। তাহাই বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের মূল ভিত্তি।

৫। কোন সময় গ্যালেলিউ এক ধর্ম্ম সভায় উপবিষ্ট ছিলেন ; এমন সময় দেখিলেন, সেই গৃহের উপরিভাগে একটি ঘণ্টা দুলিতেছে, এবং দোলন-ক্রিয়ার ক্রমিক-ভাবের হ্রাস হইতেছে,—ইহা হইতেই তিনি প্রমাণ করিলেন, এক নির্দ্ধারিত বিন্দু সংলগ্ন গোলক সমভাবে দুলিতে থাকিবে, এই ঘটনা হইতেই জগতের ঘটিকা-যন্ত্রের সূত্র পাত হয়।

৬। কোন সময়ে গ্যালেলিউ শুনিতে পাইলেন, জন্সন নামে এক ওলন্দাজ পণ্ডিত এমন এক সেন্সার সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা দ্বারা বস্তু সকলকে বিপরীত দেখা যায়। ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই খেল্না ক্রয় করেন এবং এই খেল্না অবলম্বন করিয়া পরিশেষে জ্যোতিষ্ক সমূহের তত্ত্বাবধানের মূল স্বরূপ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

৭। কথিত আছে, অধিক মাত্রায় কুইনাইন্ সেবন করিয়া জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতেই হানিমন্ স্বপ্রবর্ত্তিত চিকিৎসার সূত্রাংশ নিষ্কাশন করেন। সেই সূত্র হইতেই চিকিৎসা বিদ্যার আর একটি ভিন্ন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া আজ বিশ্ব ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য ভূমিতে সূত্র বিষয়ক এবম্ভূত বহুল ইতিহাসের অভাব নাই। যৎকালে সূত্র দৃঢ় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, কোনস্থানেই আর উহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না,—তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সহস্র যোজনান্তরের কার্য্য সকল সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের বা পরের ব্যাপার সমূহ তখন আর দূরস্থ বলিয়া মনে হয়না, হস্তামলকের ন্যায় সন্নিহিত বলিয়া নিরূপিত হয়।

অনুধ্যান করিলে সমস্ত জগৎ বুদ্ধি-দর্পণে সংক্রামিত হয়। এই সূত্র সংকলনে যিনি যে পরিমাণে পটু, তিনি সেই পরিমানে যোগী।

আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্র সমূহ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—কারণ-সূত্র, লক্ষণসূত্র ও ক্রিয়াসূত্র।

চরকে কথিত আছে—

"হেতুলিঙ্গৌষধ জ্ঞানং
স্বস্থাতুর পরায়ণম্।
ত্রিসূত্রং শাশ্বতং পুণ্যং
বুবুধে যং পিতামহঃ।

কারণ-সূত্রের দ্বারা রোগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-হেতু সকল সঙ্কলন করা যায়। লক্ষণ-সূত্রের দ্বারা রোগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান চিহ্ন ও পীড়ার শুভাশুভ ফল স্থিরীকৃত হয়। ক্রিয়া-সূত্রের দ্বারা রোগের ঔষধ বা রোগ-প্রতিকারের উপায় নিরূপিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের দ্বারা প্রতিরোগে যে

প্রয়োজ্য, সেই সকল ঔষধে কিরূপ বীর্য্য—কিরূপ ধর্ম্ম হওয়া চাই,—কিরূপ বীর্য্য বিপাক প্রয়োজন, কোন্ প্রকার দেশে বা কোন্ প্রকার কালে, কোন্ প্রকার প্রকৃতিতে কিরূপ দ্রব্য আবশ্যক, কোন্ ব্যক্তির প্রতি বা কোন্ রোগের প্রতি কিরূপ আহার-আচরণ, পথ্য বা অপথ্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের সহিত মানবের কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি—অত্যাবশ্যক তত্ত্ব সকল সঙ্কলিত হইয়া থাকে।

রোগের যেমন বিচিত্র অবস্থা অর্থাৎ কোন রোগে মলভেদ জন্মায়, কোন রোগে মল কঠিন করে, কোন রোগে শৈত্য আনিয়া থাকে, কোন রোগে উত্তাপ দান করে,—ঔষধের ও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, কোন ঔষধ ভেদক, কোন ঔষধ ধারক বা গ্রাহক কোন ঔষধ শৈত্যদায়ক, কোন ঔষধ উষ্ণ-তাপাদি জনক ইত্যাদি।

ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বা লক্ষণ যুক্ত রোগে কিরূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়—ইহা বুঝাইবার জন্য ঋষিদিগের অনেক সূত্রের সঙ্কলন করিতে হইয়াছে। আমারা তন্মধ্যে প্রথমে সামান্য সূত্রের আলোচনা করিব। বিশেষ জ্ঞানের পূর্ব্বে সামান্য জ্ঞান হওয়াই উচিত।

চরকের বিমান স্থানে লিখিত আছে—

যথাস্বং সর্ব্বেষাং বিকারানামপি চ নিগ্রহে।
হেতু ব্যাধি বিপরীত মৌষধ মিচ্ছন্তি
কুশলা স্তদর্থকারিণঃ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ:—সমুদয় রোগের প্রতিকারার্থে হেতু বিপরীত অথবা হেতু বিপরিতার্থকারী, ব্যাধিবিপরীতার্থকারী এবং উভয় বিপরিতার্থকারী ঔষধ যথাযথ স্থান বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। এইটিকে সাধারণ সূত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সমুদয় রোগের চিকিৎসাতেই ব্যাপক। রোগ যেরূপ প্রকৃতির বা যে প্রকার ধর্ম্ম লইয়া হউক না কেন, সমুদয় রোগেরই ঔষধ ইহা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিবলে স্থির হইয়াছে যে, বিরোধী পদার্থ বা ক্রিয়ার সম্পর্কে পদার্থ মাত্রেরই হ্রাস বা বিনাশ হইয়া থাকে।

শীত ক্রিয়ায় উষ্ণ নিবারণ, উষ্ণযোগে শীত প্রতিকার—ইত্যাদি ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ। এই নৈসর্গিক কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সংসাধিত হয়। প্রণালীতে বিভিন্নতা থাকিলেও বৈপরিত্য বা বিরোধিতা হ্রাস বা বিনাশের হেতু।

ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত-প্রভাবে ঋষিগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে রোগ যে কারণে উৎপন্ন অথবা যেরূপ ধর্ম্মযুক্ত, উহার বিরোধী ধর্ম্ম বা ক্রিয়াই সেই রোগের ঔষধ বা প্রশমক। উক্ত বিরোধিতা বহু প্রকার, প্রথমতঃ আমরা উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি, যথা,—সাক্ষাৎ বিরোধিতা ও পরম্পরিত বিরোধিতা, প্রভাবকৃত বিরোধিতা।

১। সাক্ষাৎ বিরোধিতা। ঔষধ শরীরের সহিত সম্পর্কিত হইবা মাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই যে বিরুদ্ধ বা বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা সাক্ষাদ্বিরোধিতা, যথা অগ্নিতাপে শীত নিবারণ, জলসেচনে দাহ বা তাপ প্রশমন।

২। পরম্পরিত বিরোধিতা,—ঔষধ শরীরে সংযুক্ত হইবামাত্র প্রথমতঃ এক প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে। পরে সেই ক্রিয়ার আনুসঙ্গিক বা সেই ক্রিয়া জন্য ক্রিয়ান্তরের

আবির্ভাব হয় তাহাই পরম্পরিত বিরোধিতা। যথা—

সিদ্ধার্থকবচালোধ্র-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনং
বমনঞ্চনিহন্ত্যাশু-পীড়াকান্‌য়ৌবনোদ্ভবান্ ॥
ভাবপ্রকাশ।

শ্বেত সর্ষপ, বচ্, লোধ, সৈন্ধবের প্রলেপে বমন প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

এমন স্থান আছে, যে স্থানে কারণের নাশ বা বিলোপ সাধন হইলে কার্য্যেরও বিনাশ ঘটে। আবার এমন ও উদাহরণ পাওয়া যায়,—যে স্থলে কার্য্যের বিনাশ ঘটিলে তাহার কারণ আপনা হইতেই লয় পায়। কোন কোন স্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যে স্থলে কার্য্য ও কারণ উভয়ের যুগপৎ আক্রমণ না ঘটিলে উহাদের বিনাশের সুযোগ ঘটে না। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের অধীন বলিয়া ঋষিগণ ঔষধ ত্রিবিধ গণনা করিয়াছেন। তৎ যথা—

হেতু বিপরীত—(নামান্তর হেতু বিরোধী বা হেতু নাশক)।

ব্যাধি বিপরীত—(নামান্তর ব্যাধি বিরোধী বা ব্যাধি নাশক)।

উভয় বিপরীত—(নামান্তর হেতু-ব্যাধি—উভয় বিপরীত বা হেতু-ব্যাধি—উভয় নাশক

১। হেতু বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ হেতু অর্থাৎ উৎপাদক-কারণের বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অথবা উৎপাদক কারণের বিনাশ ঘটিলে যাহা দ্বারা পীড়ার উপশম হয়—সেই সমস্ত ঔষধকে হেতু বিপরীত ঔষধ বলা যায়। যেমন কফজ্বরে শুঁঠ্ অথবা ক্রিমিজনিত বমন বা শূল রোগে ক্রিমি নাশক ঔষধ।

২। ব্যাধি বিপরীত ঔষধ—। যে সকল ঔষধে রোগীর শক্তিকে খর্ব্ব করে (যে কারণে রোগোৎপন্ন হইয়াছে, তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও চলিতে পারে), সেই সকল ঔষধের নাম ব্যাধি বিপরীত। যথা—খদির কুষ্ঠ নাশক, হরিদ্রা মেহ নাশক, অহিফেন অতিসার নাশক ইত্যাদি।

৩। উভয় বিপরীত ঔষধ—যে সকল ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ—উভয়-কেই এক সময়ে প্রশমিত করিতে সমর্থ, সেই সকল ঔষধকেই উভয়-বিপরীত ঔষধ বলা যায়। যথা বাত জনিত শোথরোগে দশমূল।

৪। হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ—নামান্তর হেতু সদৃশ। ব্যাধি বিপরীতার্থকারী ঔষধ—নামান্তর ব্যাধি সদৃশ ঔষধ। উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ, নামান্তর হেতু ব্যাধি উভয় সদৃশ ঔষধ।

হেতু বিপরীতার্থকারী ঔষধ,—যে সমস্ত ঔষধ—হেতুর সমান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে কারণে রোগৎপন্ন হয়—তাহার যেরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়া তদ্রূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়া যুক্ত হইয়াও রোগ প্রতিকারে সমর্থ—সেই সমস্ত ঔষধকে হেতু-বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়। যেমন মদ্য পান জনিত রোগে মদ্য।

ব্যাধি বিপরতীর্থকারী ঔষধ,—রোগের যেরূপ ধর্ম্ম, সেইরূপ ধর্ম্ম বা ক্রিয়াযুক্ত ঔষধকে ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ বলা যায়, যথা—উন্মাদ রোগে ধুস্তুর, অম্লপিত্ত রোগে জম্বীর রস, বমন রোগে মদন ফল ইত্যাদি।

উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ। যে সমস্ত ঔষধ রোগের কারণ এবং রোগ সমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও রোগ প্রতিকারে সমর্থ তাহাকে উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ বলা যায়।

যথা,—অগ্নিদগ্ধ স্থানে, অগ্নি সন্তাপ, তথা উষ্ণবীর্য্য বস্তু প্রলেপ ইত্যাদি।

তিন প্রকার সদৃশ ঔষধের মোটামুটি লক্ষণ মাত্র বলা হইল। উহাদের পরস্পরের পার্থক্য প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক।

হেতু-সদৃশ ও ব্যাধি-সদৃশ—এতদুভয়ের প্রভেদ এই যে, হেতু-সদৃশ কেবল হেতুরই. (যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয়) সদৃশ। যে ব্যাধির যে প্রকার লক্ষণ হউক না কেন, তাহার সহিত সাদৃশ্যের কোন আবশ্যকতা নাই। মনে কর, পান-দোষে অজীর্ণ, পিপাসা, দাহ—অনেক প্রকার রোগ হইয়া থাকে। ইহার যে কোন রোগ যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উপস্থিত হউক না কেন, সমস্ত রোগেই মদ্য প্রয়োগ করা যায়।

ব্যাধি-সদৃশ ঔষধ ওরূপ নহে,—অর্থাৎ যে কোন কারণে রোগ উপস্থিত হউক না কেন, ঔষধ কারণের সদৃশ না হইয়া রোগের সদৃশ হওয়া চাই। মনে কর, ধুস্তূর সেবনে উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ধুস্তূর ভিন্ন অন্য কোন কারণে যদি উন্মত্ততা উপস্থিত হয়, সে স্থলে ধুস্তূর প্রয়োগ করাই যথার্থ ব্যাধি-সদৃশ ঔষধ।

উভয় সদৃশ ঔষধ,—উভয়ের মিশ্রন লক্ষণ যুক্ত। পারদ জনিত ক্ষত রোগে পারদ প্রয়োগ অথবা অগ্নি দগ্ধ স্থানে অগ্নিরই সন্তাপ প্রদান করা—ইহাই উভয় সদৃশ ঔষধ।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বিপরিতার্থকারী বা সদৃশ ঔষধের উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সকল ঔষধ বর্ত্তমান—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মতানুযায়ী। কেননা, হোমিওপ্যাথের মতের সহিত অংশ-বিশেষে একতা থাকিলেও সর্ব্বাংশে তৎতুল্য নহে।

ঐ সমস্ত ঔষধের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও মাত্রাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে, ঐ সমস্ত ঔষধ বিপরীত ঔষধেরই অর্থাৎ এলোপ্যাথিকেরই অন্ত র্নিবিষ্ট। কেবল ধর্ম্ম গত বৈলক্ষণ্য বশতঃ নাম মাত্র পৃথক শ্রেণীভুক্ত। বমন রোগে মদন ফল প্রয়োগ করিবার বিধান থাকিলেও ইহা যাবতীয় বমন রোগে প্রয়োজ্য নহে। যে স্থানে উদরে অথবা হৃদয়ে বহু পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকে এবং ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ রোগীর বমন বা বিবমিষা উপস্থিত হয়,—এমন স্থানে উক্ত শ্লেষ্মা নিস্বারণের জন্য বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করাই আশু উপকারক। কেননা, যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নির্গত না হইলে বমন নিবারণের সুযোগ নাই। এই বিবেচনায় রোগের কারণীভূত কফের নিবারণ জন্য ঐরূপ ক্ষেত্রে মদন ফল প্রয়োগের বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং উহা হেতু বিপরীত ঔষধ বলিয়াই গণ্য।

কবিরাজ
শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী।

দুইটী চিত্র।

—:*:—

অভিব্যক্তি।

অব্যক্ত চৈতন্য, ক্ষিতি, তেজ, বায়ু ব্যোম্
ইহাতেই প্রকটিত জগৎ যেমন;
অপরূপ অভিনব সৃষ্টির গৌরব
নরদেহে একাধারে বর্ত্তমান তাহা।
মানবের পুণ্য মূর্ত্তি পৃথিবী স্বরূপ,
রস, রক্ত—অপ্; তেজঃ—শারীরিক তাপ;
প্রাণাদি বায়ুর রূপ, ছিদ্রাদি আকাশ,
নিত্যশুদ্ধ অন্তরাত্মা ব্রহ্মের সদৃশ।
ব্রহ্মার উদ্ভব যথা ঐশ্বর্য্য প্রভাবে,
অন্তরাত্মা বিভূতিতে তথা নর-মন;
ইন্দ্র যিনি নরদেহে অহঙ্কার তিনি,
উজ্জ্বল আদিত্য মাত্র পুরুষে আদান।
এ জগতে অভিহিত যাহা রুদ্র নামে,
তা'রি নাম রোষ ক্রোধ নর দেহধামে।

পূর্ণতা।

জগতের চন্দ্র যাহা, পুরুষে প্রসাদ,
জগতের বসু যাহা, দেহে তাহা সুখ;
দেহ কান্তি—পৌরাণিক অশ্বিনী কুমার
বায়ুর প্রবাহ নরে উৎসাহ অসীম।
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ দেবতা স্বরূপ,
জগতের অন্ধকার পুরুষের মোহ;
বিশ্বমাঝে জ্যোতিঃ যাহা, নরে তাহা জ্ঞান,
পুরুষের সৃষ্টি ক্রিয়া রঙ্গ দ্যুলোকের।
সত্যযুগ প্রকাশিত নরের শৈশবে,
ত্রেতাযুগ দৃশ্যমান যৌবনাবস্থায়;
রুগ্নতা ও স্থবিরতা দ্বাপর ও কলি,
যুগান্ত প্রলয় যাহা মৃত্যু তাহা নরে।
অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তি এই নরদেহে,
বিরাজেন চিদানন্দ এই পুণ্য দেহে।

শ্রীমণীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

শ্বেত প্রদর চিকিৎসা।

—:*:—

ঠাকুমা ও ছোট বৌ।

ছোট বৌ। তোমার দু'টি পা'য়ে পড়ি ঠাকুমা, তুমি ঠাকুরকে বল—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে। তুমি ব'ল্লে, আর কেউ রদ্ ক'র্‌তে পারবে না।

ঠা। তা' আমার পায়ে না হয় পড়্‌লি, আমি না হয় ব'ল্লাম্, কেউ না হয় রদ্ কর্‌তে পারলে না, কিন্তু একটা কাজ কর্‌তে গেলে —বিবেচনা ক'রতে হ'বেত—যে কাজটা ভাল কি মন্দ।

ছো। তা' তীর্থ ক'রতে যা'ব,—এ আর কি মন্দ?

ঠা। দেখ্ সব্ কাজেরই একটা সময় অসময় আছে। যে বয়সের যা'—সেই বয়সে সে'টা মানায় ভাল। তোর কি এখন তীর্থ ক'র্‌তে যাবার বয়েস?

ছো। তা' ধর্ম্মের কাজে আব্‌র বয়েস কি ঠাকুমা?

ঠা। সব কাজেরই বয়েস আছে। এখন

সংসারের কর্ম্ম করাই তোমার ধর্ম্ম। সংসার কয়, ছেলে-পিলে নাতি-নাত্নী হোক, তা'র পর তীর্থ কর্তে যেয়ো।

ছো। আমার যে যা'বার জন্যে বড় মন কেমন ক'রছে ঠাকুমা।

ঠা। মন এমনই চঞ্চল যে, অনেক সময় অনেক অন্যায় কাজের জন্যে 'কেমন'ই করে—বাকুল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রবৃত্তিকে দমন করাই মানুষের কর্ত্তব্য। যে দমন না ক'রতে পারে, তার নিশ্চয় অধঃপতন ঘটে।

ছো। কিন্তু এতে ত পুণ্যি হয় ঠাকুমা।

ঠা। না, এবয়সে সংসার ছেড়ে—নিজের কর্ত্তব্য ছেড়ে কোথায়ও গেলে তা'তে পুণ্যি হয় না, পাপ হয়। সংসারে থেকে পুণ্যি করাই এখন তোমার উচিত।

ছো। সংসারে থেকে আর কি পুণ্যি করবো? তীর্থের মত পুণ্যি কি এখানে হয়?

ঠা। বটে? এ বয়সে সংসারই যে মহা-তীর্থ। স্বামী সেবা কর, গুরুজনের সেবা কর, বাড়ীর জীব-জন্তু, চাকর-বাকর, লোক-জন যা'তে সুখে থাকে, কষ্ট না পায়—তা' কর, অতিথ-ফকিরকে আহার দাও, ভিক্ষা দাও,—এতে এখানে থেকে যে পুণ্য হবে, শত তীর্থে গেলেও সে পুণ্য হবে না। বরং এসব না করার জন্য তা'তে পাপ হবে।

ছো। পাপ কিসে হবে?

ঠা। তোমার গুরুজন, তোমার স্বামী, তোমার সংসারের চাকর বাকর গরু-বাছুর—সকলের প্রতি তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য না ক'রে,—তুমি অন্য যত ভাল কাজই করনা, তাতে পাপ বই পুণ্য হবে না।

(লীলা ও রমার প্রবেশ)

লী। কিসে পুণ্য হবে না ঠাকুমা?

ঠা। এই দেখনা—গোবিন্দ আর বউমা তীর্থ ক'রতে যাচ্চে, ছোট বলে, আমায় ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

লী। তা'তে বাড়ীর সকলের মত কি?

ঠা। কারুরই মত নেই। ওর স্বামীর নেই, ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর নেই, গিন্নি,—এমন কি, ঝি অবধি মানা করছে। ও এখন আমার এসে ধ'রেছে, যে, আমি ব'লে দিলেই ওর যাওয়া হয়।

লী। হাঁ ছোট বৌ, গুরুজনদের মনে কষ্ট দিয়ে তীর্থ ক'রতে গেলে কি পুণ্য হয়? তুইত এখন মানুষের মত হ'য়েছিস্, এটা আর বুঝতে পার্লিনে।

ছো। বুঝ্তে একেবারে পারিনি,—তা'নয়, তবে মনে বড় ইচ্ছে হ'চ্ছিল। কত কি দেখ্তে পেতাম।

লী। তা' ওর বড় দোষ নেই ঠাকুমা, অনেক নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মনে কষ্ট দিয়ে অনেক সময় লুকিয়ে তীর্থ ক'র্তে চ'লে যায়, তা'রা বোঝে না যে, এতে তাদের পুণ্যি হয় না, পাপ হয়। এই রকম ক'রে আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে যে কত অধর্ম্ম হ'চ্ছে তা'র ঠিক নেই।

ঠা। তা'ত হচ্চেই। বিশেষ আমাদের দেশে আগে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণপাঠ, কথকথা প্রভৃতি খুব চলিত ছিল ব'লে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের অনেক জ্ঞান হ'ত। এখন সে গুলো প্রায় লোপ পেয়ে আস্ছে, মহাভারতে ধর্ম্ম-ব্যাধের যে একটী গল্প আছে—তা'তেই এই রকম ব্যাপারে ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম কি, বেশ বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

লী। ছোট বৌয়ের কি এখনও যেতে ইচ্ছে আছে নাকি?

ছো। একে ঠাকুমা,—তা'তে তুমি, আর ইচ্ছে কি থাকে ঠাকুরঝি। যাই—আমি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিই গে।

ঠা। লীলা কখন্ এলি? বাড়ীর সব খবর ভালত?

লী। এই আস্‌ছি ঠাকুমা। বাড়ীর সব খবর তোমার আশীর্ব্বাদে ভালই। বাবা-মা তীর্থ করতে যা'বেন শুনে, একবার দেখ্‌তে এসেছি। আর তোমার একটী রোগী সঙ্গে ক'রে এনেছি। এ আমার সই রমা. তুমিত চেন। তুমি রোগীর ব্যবস্থা কর, আমি সকলের সঙ্গে দেখা করিগে।

(লীলার প্রস্থান)

ঠা। আয় রমা, বোস্। তাইত বড্ড রোগা হ'য়ে গেছিস যে!

রমা। (প্রণাম করিয়া) অনেক দিন থেকে অসুখে ভুগছি ঠাকুমা। কত চিকিৎসা করলাম, কিছুতেই কিছু হলোনা। শেষে সইএর পরামর্শে তোমার কাছে এসেছি।

ঠা। তা' কি অসুখ হয়েছে তোর?

র। কবিরাজেরা বলে শ্বেত প্রদর।

ঠা। কত দিন হ'য়েচে?

র। হয়েছে আজ ৯।১০ বছর। প্রথমে রক্ত ভাঙ্গা রোগ ছিল, ক্রমে শ্বেত প্রদরে দাঁড়িয়েছে।

ঠা। ছেলে-পিলে কিছু হয়েচে?

র। দু'টি ছেলে,—একটী আঠার বছর বয়সের সময় হয়েছে, তার তিন বছর আগে থেকে রক্ত ভাঙ্গা রোগ হয়। বড় খোকার হ'বার পরে থেকেই এই রোগের সূত্রপাত। দু'বৎসর পরে ছোট খোকা হয়। তা'র পর পাঁচ বৎসর হ'ল আর ছেলে পিলে কিছু হয় নি।

ঠা। এখন রোগের অবস্থা কি রকম বল দেখি?

র। এখন দিন-রাত জলের মত ভাঙ্গে,—দুর্গন্ধি। মাসিক বেশ পরিষ্কার হয়না। ক্ষিদে নেই, মাথা ঘোরে, বুক ধড়-ফড় করে, মনে কেমন ভয়-ভয় হয়, সংসারের কিছুই ভাল লাগেনা।

ঠা। তাইত—এ রোগ বড় বিশ্রী, সহজে সারতে চায় না। অনেকদিন ধরা-কাটা কর্‌লে—তবে যদি সারে।

র। তা' তুমি আমায় যা' করতে ব'লবে, আমি তাই ক'রবো ঠাকুমা।

ঠা। প্রথম কথা এই, স্বামীর কাছ থেকে তফাতে থাকৃতে হবে।

র। আজ ছমাস থেকে তা'ই আছি ঠাকুমা।

ঠা। তা'র পর—এখন কিছু দিন একেবারে শুয়ে থাকৃতে হবে, কোন কিছু ক'রতে পাবে না। তা'র পর, যত দিন সুস্থ না সারে, ততদিন কোন পরিশ্রমের কাজ মোটেই করবে না, সিঁড়ি-ভাঙ্গা হ'বে না, কোন ভারী জিনিষ তুলতে পাবেনা, ফল কথা, যা'তে তলপেটে চাড় লাগে—এমন কোন কাজ করতে পা'বে না।

র। আচ্ছা ঠাকুমা, আমি তাই ক'রবো। তুমি ওষুদ-পথ্যির কথা বল।

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি, শোন। দুধ-ভাত, গাওয়া-ঘি, ফুলকো লুচি—এসব খেতে পার। রাত্রে যদি বেশ ক্ষিদে না হয়—তা হ'লে দৈ-দুধ—কি দুধ-বার্লি—মিছরী দিয়ে খাবে। তরকারীর মধ্যে পটোল উচ্ছে, পলতা, কাঁচকলা, ন'টেশাক, পাকা দেশী কুমড়ো—এইসব খেতে পার, কিন্তু তরকারী

যত কম খাও—ততই ভাল। বেশী তরকারী খাওয়া ভাল নয়।

র। তা' তরকারী আমি বেশী খাইওনে। দাল খাওয়া চল্‌বে না?

ঠা। মুগ, মসুর, ছোলা আর অড়হর দাল খেতে পার। কিন্তু দাল ছেঁকে ফেলে দিয়ে কেবল যূষ টুকু খাবে।

র। মাছ মাংস কিছু খাওয়া যায় না?

ঠা। না এখন মাছ-মাংস কিছুই খেয়ে কাজ নেই, একটু ভাল হ'লে তখন দেখা যাবে।

র। জলখাবার কি খাওয়া যেতে পারে?

ঠা। দাড়িম, বেদানা, কেশুর কিসমিস পানফল, মিছরী—জল খাবারে এই সব খেতে পার।

র। খাবার সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম আছে?

ঠা। অন্য নুণ না খেয়ে সন্ধব নুণ খাবে, আর তরকারীতে যেন লঙ্কার ঝাল দেওয়া না হয়। শাক্, অম্বল, কলায়ের দাল, দই—এসব একেবারে ছোঁবে না।

র। আচ্ছা, এখন ওষুদ কি খা'ব বল ঠাকুমা?

ঠা। খাবার ওষুদ পরে ব'লছি, জল ভাঙ্গাটা কি খুব বেশী?

র। হাঁ, আজ মাসখানেক থেকে বড্ড বেড়েছে।

ঠা। তা' হলে প্রথমে দিন কতক ডুস নিতে হবে।

র। সে আমি পারবোনা ঠাকুমা, তা'তে মরি আর বাঁচি।

ঠা। কেন পার্‌বিনে? নিজে নিজে নিবি অন্য কারুর সাহায্য দরকার হ'বে না।

র। তা' যদি হয় তা'হলে পার্‌বো। আচ্ছা হাঁ ঠাকুমা, তুমিত কবিরাজী মতে ব্যবস্থা দাও, কবিরাজীতে ত ডুসের ব্যবস্থা ছিল না!

ঠা। কেন থাকবে না?—বরং ডাক্তারীতে যা' আছে, কবিরাজীতে তা'র চেয়ে খুব বেশী রকমই ছিল, তবে ডুস নাম ছিলনা, ডুস্‌ ইংরাজী নাম, আর ওর কবিরাজী নাম বস্তি।

র। আচ্ছা কি ক'রে ডুস নিতে হ'বে বল?

ঠা। শোন বলি। এক ছটাক বাবলা ছাল আর আধতোলা জনকপুরী খয়ের—দু'সের জলে সিদ্ধ ক'রে, এক সের থাকতে নামা'বি। তা'র পর ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে, ডুসের যে পাত্র থাকে—তাইতে রাখবি। সেই পাত্রটী দেয়ালের গায়ে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌তে হয়। তা'র সঙ্গে একটা লম্বা নল থাকে আর সেই নলের গোড়ায় একটা কল থাকে। সেই কল ঘুরিয়ে দিলেই নলের মুখের ভেতর দিয়ে বেগে কাথ বেরিয়ে আসে। ডুস্‌ এমন ভাবে নিতে হয়—যেন নাড়ীর (জরায়ু uterus) ভেতর পর্য্যন্ত জল যায়।

র। ডুস কি রোজ নিতে হবে?

ঠা। প্রথমে উপরি উপরি ৩।৪ দিন, কি যে কয় দিন নিলে জল ভাঙ্গা খুব ক'মে যায়—কি বন্ধ হ'য়ে যায়—তত দিন নিতে হবে। তা'রপর সপ্তায় দু' দিন করে নিলেই হবে।

র। এরকম কত দিন নিতে হবে?

ঠা। এ রোগের নিয়ম হ'চ্চে যে, ডুস্‌ নিলেই জল ভাঙ্গা বন্ধ হয়, আর ডুস বন্ধ করলেই আরম্ভ হয়। প্রথমে তিন মাস যে রকম বল্‌লাম, সেই রকম নিবি। তা'র পর কিছু দিন—সপ্তায় এক দিন—এম্‌নি ক'রে যত দিন না রোগ ভাল হ'য়ে যায়, তত দিন নিবি।

র। আচ্ছা এখন খাবার ওষুদ বল।

ঠা। শ্বেত ধুনা, রসসিন্দুর আর বঙ্গ ভস্ম সমান ভাগে মিশিয়ে দু'রতি মাত্রায় মধু দিয়ে মেড়ে, শ্বেত চন্দনের ক্বাথ—কি রক্ত চন্দনের ক্বাথ মিশিয়ে নিয়ে খা'বি।

র। আর এতে যদি উপকার না হয় ঠাক্মা?

ঠা। উপকার হ'বে বৈকি। তা' না হয় আরও একটা ওষুদের কথা বল্‌ছি শোন্,—শ্বেত কুঁচের শিকড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্ত-চন্দন, অনন্তমূল, অর্জ্জুন ছাল, খয়ের কাঠ আর অশোক ছাল—প্রত্যেক জিনিষ এক সিকি ক'রে নিয়ে, থেঁতো ক'রে, নূতন হাঁড়িতে—কাঠের জালে আধ সের জল দিয়ে সিদ্ধ করবি। আধ পোয়া থাকৃতে নামিয়ে, ছেঁকে নিয়ে কুসুম-কুসুম গরম থাক্‌তে খেয়ে নিবি।

র। আচ্ছা ঠাক্মা, রস সিন্দুর আর বঙ্গ পাব কোথায়?

ঠা। কোন কবিরাজের কাছে থেকে কিনে নিবি। রসসিন্দুর দু'রকম পাওয়া যায়, এক রকম মোটা আর এক রকম চটি; চটি রস-সিন্দুরই ভাল।

র। আর কোন ওষুদ খেতে হবেনা?

ঠা। এই ওষুদ খেয়ে জল ভাঙ্গা বন্ধ হলে, কি খুব কমে গেলে, ওলট কম্বলের কাঁচা ছাল আধ তোলা আর মরিচ এক সিকি—এক সঙ্গে বেটে খাবি।

র। তখন কি আগেকার ওষুদ ছেড়ে দেব?

ঠা। না, সকালে আগেকার ওষুদ খাবি, আর বিকালে ওলট কম্বলের ছাল খাবি। ৫।৭ দিন ওষুদ খেয়ে দু' এক দিন বন্ধ দিবি। ঋতুর তিন দিন কোন ওষুদই খাবিনে। আর সকালের ওষুদ না হ'ক, ওলট কম্বলটা ঋতু হ'বার আগে তিন দিন—আর ঋতুর পরে তিন দিন খাওয়া চাই।

র। আচ্ছা ঠাক্মা, যে রকম ব'ল্‌লে, সবই ঠিক সেই রকম কর্‌বো। আশীর্ব্বাদ কর—যেন ভাল হ'তে পারি।

ঠা। ভাল হবে বৈকি, তবে সময় একটু লাগবে। দেখ্ আর একটা কথা ব'লে দিই,—যে সব ওষুধের কথা বল্‌লাম, সে সব খেলেই সেরে যা'বে, তবে যদি এক সপ্তা' খেয়ে না সারে, তা'হলে ও সব ওষুদ ত খা'বিই, তা' ছাড়া কাঁচা অশোকছাল দু' ভরি, আধ পোয়া দুধ ও দেড় পোয়া জল—এক সঙ্গে কাঠের আগুণের জালে সিদ্ধ ক'রে, দুধটুকু মাত্র থাকৃতে নামিয়ে নিয়ে, ঠাণ্ডা হ'লে সেটাও রোজ একবার ক'রে খা'বি। এটাও খুব ভাল ব্যবস্থা,—এ ব্যবস্থায় শ্বেত প্রদর কি রক্ত প্রদর—সব রকম প্রদরেই উপকার পাওয়া যায়। সব কথাই তোকে ব'লে দিলাম, যা' হোক এই সব ক'রে যেমন থাকিস্, মাঝে মাঝে খবর দিস্।

র। খবর দেওয়া কি—আমি নিজেই আস্‌ব।

(লীলার প্রবেশ)

লী। কি লো সই, তোর সব কাজ হ'য়েছে?

র। হাঁ, যা' জানবার—সব জেনে নিয়েছি।

লী। তবে এখন আসি ঠাকুমা, বাবা-মা চ'লে যা'বেন, বড় মন কেমন ক'র্‌চে।

ঠা। কা'কে বল্‌ছ, দিদিমণি। তোর বাবা যে আমার নাড়ী-ছেঁড়াধন। আর জীবনে কখন কাছ ছাড়া হয় নি। তা' আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি—ওর পায়ে কাঁটাটি ফুটবে না। চল্ আমিও একবার দেখে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

তামাকের ইতিবৃত্ত।

বর্ত্তমানকালে সমুদায় সভ্যজাতির মধ্যে তামাকের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও ইহার প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। এখন তামাক না দিলে অভ্যাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে তামাক খান না, তাঁহাকেও অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের ভদ্রোচিত সমাদরের জন্য তামাকের বন্দোবস্ত করিতে হয়। উৎসবাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনার জন্য তামাকের বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সভ্য জগত ইহার অস্তিত্ব অবিদিত ছিল। কেবল আমেরিকার তাৎকালীন অনাবিস্কৃত দেশবাসী কতিপয় অসভ্যজাতির মধ্যে ইহার প্রচলন ছিল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন কলম্বস্ কিউবা দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি দুইজন নাবিককে উক্ত দ্বীপ পরিদর্শনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া নবাবিস্কৃত স্থানের যেরূপ অভিনব বর্ণনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী বিবরণ এই যে, তথাকার অধিবাসীরা প্রজ্জলিত যষ্টি খণ্ড সঙ্গে করিয়া বেড়ায় এবং মুখ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গত করে। এই ঘটনাটীতে নাবিকদ্বয়ের মনে প্রথমে ধারণা হইয়াছিল যে, আদিমবাসীরা তাহাদের দেহ সুগন্ধিকরণের জন্য বোধ হয় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, ঐ নগ্ন অসভ্যেরা বড় বড় পত্রগুচ্ছ একত্র যষ্টির মত পাকাইয়া অগ্নিসংযোগে উহার ধূমপান করিয়া থাকে।

তামাক সেবন-রীতি সভ্যজাতির দৃষ্টি পথে এই প্রথম পতিত হইল। ক্রমে এই জঘন্য রীতি সভ্যজগতে এত প্রচলিত হইল যে, প্রত্যেক নগর, উপনগর, গ্রাম ও পল্লী এই বিষাক্ত পত্রের ধূমে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। যাহাহউক এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সভ্যজাতির মধ্যে তামাক সেবন প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রথমতঃ ইহা অতি ঘৃণিত পদ্ধতি বলিয়াই তখন তামাকের উপর সকলের ধারণা ছিল। এমন কি, ইউরোপের কোন সাম্রাজ্য তামাক সেবন অপরাধে দণ্ডিত হইবে—তখন এরূপ ব্যবস্থাও হইয়াছিল। রুসরাজ্যে তামাক সেবন করার প্রথম অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় বার অপরাধের জন্য নাসাচ্ছেদ ও তৃতীয় অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় অপরাধের জন্য সর্ব্বসমক্ষে কয়েক জনের নাসাচ্ছেদ করাও হইয়াছিল। খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম সমাজের প্রধান গুরু রোমের পোপ দ্বাদশ ইনসেণ্ট এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি উপাসনা-মন্দিরে তামাক চর্ব্বন বা ধূমপান বা অন্য কোন উপায়ে উহা ব্যবহার করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে। ইহার বহুকাল পরে পোপ বেনিডিক্ট নিজে ধূমপায়ী হইলেন, এবং তিনি এই দণ্ডবিধি রহিত করিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও পারস্য দেশেও তামাক সেবন অপরাধের জন্য রাজদণ্ডের নির্দ্দেশ হইয়াছিল। ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম জেমসের অনুকরণে আমেরিকার উপনিবেশ সমূহের শাসন

কর্ত্তারাও এই অপরাধের জন্য দণ্ডবিধি আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই সকল দেশের রাজপুরুষেরাও তামাক ভক্ত হইয়া পড়িলেন, ক্রমে ক্রমে দণ্ডবিধি আইন শিথিল হইয়া অবশেষে একেবারেই লোপ পাইল।

ভারতবর্ষেও পুরাকালে তামাকের প্রচলন ছিলনা। কোন্ সময় হইতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অভিধানে যে তাম্রকূট কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন্ সময় কিরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ভাঙ্গ, ধুস্তূর, সুরা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাম্রকূটের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। সুতরাং তাম্রকূটের ব্যবহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কি কারণে তাম্রকূট নাম হইয়াছে, তাহারও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া অর্থ করিলে, তাম্র শব্দে কুষ্ঠরোগ বিশেষ ও কূট শব্দে বৃক্ষ, তাম্ররোগোৎপাদক বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ধূমপান দ্বারা স্মোকার্স ক্যান্সার্ (Smokers cancer) নামক যে রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাম্ররোগ বোধ হয় তাহারই অনুরূপ। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বাঙ্গালার কবিগণের গ্রন্থে,—এমন কি প্রাচীন কবিদের শেষ কবি ভারত চন্দ্রের গ্রন্থেও তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়না। ঐ সকল গ্রন্থে ভোজনান্তে মুখশুদ্ধির জন্য তাম্বূলের উল্লেখ আছে, কিন্তু তামাকের উল্লেখ নাই। বর্ত্তমান কবিদের আদিকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থে তামাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনা করিলে বোধ হয়, মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে এদেশে তামাকের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে বাঙ্গালাদেশে ইহার বহুল প্রচলন হইলেও ইহা যে অবৈধ প্রথা, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এখনও গুরুজন ও মাননীয় ব্যক্তিগণের সমক্ষে তামাক সেবন ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

তামাকের পাতা হইতে যে তৈলাক্ত নির্য্যাস প্রস্তুত হয়, তাহাকে নিকোটিন্ বলে। প্রতি পাউণ্ড তামাকের পাতায় ৩৮০ গ্রেণ নিকোটিন্ পাওয়া যায়। ১/৮ গ্রেণ নিকোটিন্ দ্বারা ৩ মিনিট কাল মধ্যে একটী কক্কুরের মৃত্যু হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা অর্দ্ধ মিনিট মধ্যে মনুষ্য জীবন নষ্ট হইতে শুনা গিয়াছে। নিকোটিন্ সময়ে সময়ে নরহত্যা বা আত্মহত্যার জন্য ব্যবহৃত হইতে শুনা গিয়াছে। নিকোটিনের মত প্রুসিক্ এসিড্ ভিন্ন অন্য কোন বিষে এত শীঘ্র মৃত্যু হইতে শুনা যায় নাই।

হোটেন্‌টটেরা সর্পাদি বিনাশের জন্য তামাকের তৈল ব্যবহার করে। উদ্যান রক্ষকেরা ইহা প্রচুর ব্যবহার করে। শিশুদের মস্তক বা মুখমণ্ডলের ক্ষততে সামান্য মাত্র এই তৈল প্রয়োগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মৃত্যু সংঘটনের দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। একটী চুরুটের পাক খুলিয়া উহাতে যতগুলি পাতা থাকে, সেই গুলি উদরের উপর স্থাপন করিলে অত্যল্পকাল মধ্যেই বমনোদ্রেক হয়। এক সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডের ভীরু সৈনিকেরা

রণক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিবার জন্য বগলের মধ্যে তামাকের পাতা রাখিয়া দিয়া অত্যন্ত বমন করিত।

ডাক্তার রিচার্ডসন্ সম্প্রতি মনুষ্য দেহে তামাকের ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যাঁহারা প্রথম তামাক খাইতে শিখিতেছেন, তাঁহাদের জীবনী শক্তি সঞ্চারক যন্ত্র সমূহের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছেন,—"মস্তিষ্ক মলিন ও রক্ত হীন হয়, আমাশয়ে গোলাকার উচ্চ লাল লাল দাগ হয়; রক্ত অস্বাভাবিক তরল হয়; ফুস্ফুস দ্বয় মলিন হয়; হৃৎপিণ্ডে প্রচুর রক্ত জমিয়া থাকে, এবং উহার সঙ্কোচনী শক্তি নষ্ট হইয়া কেবলমাত্র ধীর প্রকম্পন পরিলক্ষিত হয়।"

এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, তামাক যদি এতই বিষাক্ত, তবে যাবতীয় ধূমপায়ীগণেরই তামাকের বিষে মৃত্যু হয়না কেন? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের শরীর ও শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহ এতই অভ্যাসের বশবর্ত্তী যে, অভ্যস্ত হইলে অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, আচার-ব্যবহার, আহার্য্য-পানীয়—সবই সহ্য হইয়া থাকে। অনেককে মর্ফিয়া, ষ্ট্রীকনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক বিষ মাদকরূপে সেবন করিতে দেখা যায়। ডাক্তার কিলগ প্রভৃতি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে. তাঁহাদের মতে অধিকাংশ তামাকসেবনকারী তামাকের বিষেই জীবন ত্যাগ করে। বিষ খাইবা মাত্র মৃত্যু হইলেই যে বিষে মৃত্যু হইল এবং বহু বৎসর পরে মৃত্যু হইলে যে তাহার কারণ পূর্ব্বেকার বিষ-ভক্ষণ নহে—এরূপ বলিতে পারা যায় না। তাঁহারা বলেন, যদি তামাক সেবন জন্য পাঁচ বৎসরও আয়ুঃ হ্রাস হয়, তাহাকেও বিষ ক্রিয়ার ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং এই অকাল-মৃত্যুকে বিষ ভক্ষণে মৃত্যু বলিতে হইবে।

জীবন রক্ষার জন্য রক্তই আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদান। নৈসর্গিক ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অনবরত আমাদের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যে ক্ষয় হইতেছে, রক্তই সেই সমুদায় ক্ষতিপূরণ করে। রক্ত আবার আমাশয় ফুসফুস্ ও চর্ম্মের মধ্য দিয়া প্রয়োজনীয় উপাদান সকল প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্রব্য দ্বারা রক্ত দূষিত হয়, তাহা সমুদায় শরীরেরই বিনাশ সাধন করে। তামাক সেবন দ্বারা রক্তের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তদ্দ্বারা যে কেবল জীবনীশক্তির হ্রাসতা হয়, তাহা নহে, দেহের রোগপরিবর্জ্জনী শক্তিও উহার দ্বারা লুপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তামাক সেবনকারীর সংক্রামক অসংক্রামক—সকল প্রকার রোগ দ্বারাই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

তামাক সেবনে গলক্ষত, যক্ষ্মা, হৃদপিণ্ডে নানাপ্রকার পীড়া সমূহ, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অধর ও জিহ্বায় কর্কশতা, পক্ষাঘাত, দৃষ্টি-হীনতা, বর্ণান্ধতা, (Colorblindues), ও নানাপ্রকার স্নায়বীয় রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।*

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

*বর্ত্তমান সময়ে বাজারে যে তামাক বিক্রীত হয়, উহা সেবনে আমাদের অনিষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইতেছে, কারণ উহা শুধু তামাক নহে, সস্তায় বিক্রয় করিবার জন্য উহার সহিত চট্ ছেঁড়া, পাটির কুচি পেঁপের পাতা এবং ঐ জাতীয় আরও অনেক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। ইহা ভিন্ন সুগন্ধিকরণের জন্য এবং মিষ্টতা সাধনার্থ কাঁটালের রস, শিলারস প্রভৃতিও উহার সহিত মিশান হইয়া থাকে। ফলে তামাকের সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করায় তামাক সেবনের অপকারিতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দেশে যে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে, আমাদের মনে হয়, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। তামাকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহারের ফলে শারীর যন্ত্রের নানাপ্রকার বিকলতা উপস্থিত হয়। এই প্রবন্ধের লেখক সেই সকল চিত্র "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করিলে দেশের উপকার করিতে পারিবেন।

আঃ সং।

নারী ও নারায়ণ তৈল।

—:*:—

১৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। আমার এক মাত্র কন্যা "সরযূর" সাংঘাতিক রোগ হইয়াছিল। বাঁচিবার কোনও আশাই ছিলনা। একদিকে ভীষণ যমদূত, অপর দিকে আমরা দুই স্ত্রী-পুরুষ—রীতিমত যুদ্ধ চলিয়াছিল। এইরূপে চল্লিশ দিন, দিবা-রাত্রি, যুদ্ধ করিয়া যমদূত গুলার পরাজয় ঘটিল। সরযূ বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু শমন দূতগণ সমরাবসানের যে চিহ্ন রাখিয়া গেল,—তাহাতেই আমায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

কথাটা এই—"সরযূ" দেখিতে সুন্দরী ছিল না। তাহার উপর এই রোগে তাহার মাথার চুলগুলি একেবারেই উঠিয়া গেল। প্রথমে এদিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, শেষে সরযূর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই আমাদের চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। আমরা হিন্দু,—কন্যাকে চির কুমারী করিয়া রাখিতে পারিনা। কাজেই সরযূর বিবাহের জন্য আমি বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। যিনিই কন্যা দেখিতে আসেন, তিনিই তাহার কেশ-বিরল-মস্তক দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন। পাড়ায় দুষ্ট মেয়েগুলা, আমাদের সাক্ষাতেই মেয়েটাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল—

"ও সরযূ! নেড়ী,
মেড়ার পালের মেড়ী"

এই অপূর্ব্ব কবিতার অমিয় রস, আমাদের "শ্রবণ ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো! আকুল করিল বড় প্রাণ।" কন্যার মলিন মুখ খানি, দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত সর্ব্বদাই অন্তরে জাগিতে লাগিল। আমার ধৈর্য্য টুটিল। আমি বড়ই বিচলিত হইলাম।

বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন, "ডাক্তার দেখাও।" শেষে বালিকার অনুর্ব্বর-মস্তকে "ক্যান্থারাইডিলের" রীতিমত আবাদ আরম্ভ হইয়া গেল। মানে, কিন্তু "লাভ পরং গোরধঃ", চুল গজান দূরে থাক্, কন্যার মাথাটী—ব্রণ-সঙ্কুল হইয়া উঠিল। ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিলাম। কিছু দিন পরে অবশ্য ক্ষত শুকাইল। একজন বড় ডাক্তারকে মেয়েটীকে আবার দেখান হইল, তিনি বলিলেন—"যে যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আর কেশোদ্গমের আশা নাই।" তিনি অনেক ঔষধ দিলেন, কোন ফলই হইল না।

আমাদের পল্লীগ্রামে অনেক প্রবীনা স্ত্রী-লোক থাকেন,—যাঁহারা অনেক টোট্‌কা জানেন; কিছু দিন তাঁহাদের কথাও শোনা গেল। কেহ নির্জ্জলা আদার রস মাখাইতে বলিলেন, কেহবা জায়ফল বাটিয়া প্রলেপের ব্যবস্থা করিলেন, আবার কেহবা কন্টকময় ওকৃড়া ফল ঘষিবার পরামর্শ দিলেন। নানা চিকিৎসায় মেয়েটাও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এই বার কেশ-তৈলের পালা! সেণ্টেড্-ক্যাষ্টরঅয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া "জাতি কুসুম" "অপরাজিতা কুসুম" পর্য্যন্ত সমস্ত তৈলই আমার ক্ষুদ্র গৃহে সমবেত হইলেন! হায়! আমি অতি দুর্ভাগ্য! নহিলে যে সকল তৈল মাখিয়া কত নিরক্ষর মূর্খ কবি হইয়াছে, কত ঐশ্বর্য্যশালী-প্রেমিক-পুরুষের কমঠ পৃষ্ঠ-

টাকে চমরী লাঙ্গুলের মত চুল গজাইয়াছে,—কত বিরহিনীর মুখে হারাণ-হাসি দেখা দিয়াছে, একে একে সেই সকল ঢক্কা-নিনাদী অপূর্ব্ব কেশ-তৈল আমার কন্যার মস্তকে বসুধারার মত সপ্তধারায় ঢালিয়াও কোন ফল পাইলাম না কেন? অথচ এই সকল তৈল-ব্যবসায়ীরা তৈল বেচিয়া 'ব্রুহামে' চড়িয়া বেড়াইতেছে !!

বিজ্ঞাপনের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিল। কেশ তৈলের বাকী শিশিগুলা ষণ্ড-বাহিত-মিউনিসিপ্যালিটির ক্যাবেঞ্জারের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। আবিষ্কারকদের ইহাই যোগ পুরস্কার।

এই সময় একদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু * আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কথা প্রসঙ্গে বন্ধুকে মেয়েটার অবস্থা নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন—"কোন ও কবিরাজী তৈল ব্যবহার করিয়াছে কি?" আমি উত্তর দিলাম—মাপ করিবেন, আর তৈলে আমার ভক্তি নাই। তৈল মাখিয়াই মেয়েটার মাথা আরও তেলা হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু চলিয়া গেলেন। ৬।৭ দিন পরে আমার নামে একটা পার্শেল আসিল, তাহার ভিতরে একটা শিশি ও একখানি পত্র। পত্র খানি পাঠ করিলাম। বন্ধু লিখিতেছেন—

"আমার বাসার পার্শ্বে একজন প্রবীন কবিরাজ আছেন, তাঁহাকে তোমার কন্যার কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি এই তৈলটুকু দিয়াছেন। ইহার নাম—"নারায়ণ তৈল"। তোমার কন্যার জন্য পাঠাইলাম। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি?"

বন্ধুর পত্র খানি পড়িয়া ভাবিলাম,—বন্ধুর একটু ভুল হইয়াছে। এ 'নারায়ণ' তৈল আমার কন্যার জন্য নহে; আমারই জন্য; কেন না, কন্যার জন্য ভাবিয়া-ভাবিয়া আমারই উৎকট উন্মাদ রোগের সম্ভাবনা,—কবিরাজ মহাশয় হয়ত আমারই জন্য 'নারায়ণ তৈল' ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি তৈলের শিশিটি সেল্ফের উপর তুলিয়া রাখিলাম।

বোধ হয় একমাস পরে—একদিন দেখিলাম—আমার কন্যার মাথার স্থানে স্থানে নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এমন সময় গৃহিনী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—তোমার বন্ধুর পত্র খানি আমি পড়িয়াছিলাম। তিনি যে তৈল পাঠাইয়াছেন—তাহাও জানিয়াছিলাম। তোমায় অজ্ঞাতসারে আমিই মেয়েটাকে জোর করিয়া তৈল মাখাইতে আরম্ভ করি। আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। দেখ—মেয়ের মাথায় কেমন চুল উঠিতেছে। আর বেশী তৈল নাই। তোমার বন্ধুকে আর এক শিশি পাঠাইতে বলিও।"

এ কি স্বপ্ন না সত্য! যে 'নারায়ণ তৈল' বায়ু রোগের ঔষধ বলিয়া জানিতাম, তাহাতে কি কেশ-পাতও ভাল হয়? আয়ুর্ব্বেদ তবে অসাধ্য সাধন করিতে পারে! তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিলাম। আর এক শিশি তৈল আসিল। মধুর ভক্তিরসে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

১০।১২ দিনের মধ্যেই মেয়ের মাথায় অনেক চুল গজাইল, তাহার লুপ্ত শ্রী ফিরিয়া আসিল। আমি আর্য্যঋষির চরণ-উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

---

* শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।

'নারায়ণ তৈল' যে ইওলুপ্ত রোগের ঔষধ,—হয় ত অনেক কবিরাজই একথা জানেননা। অনেক বিলাসী ও বিলাসিনী—চুলের পাট করিয়া থাকেন, চুলের জন্য—ছাই-ভস্ম কিনিয়া অনেক বাজে খরচ করেন; আমি তাঁহাদিগকে একবার "নারায়ণ তৈল" মাখিতে অনুরোধ করি।

প্রাচীনকালে নারী-সমাজে 'নারায়ণ তৈলের' যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। প্রাচীন কাব্যে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সওদাগর ধনপতি যখন সিংহল হইতে দেশে ফিরিয়াছিলেন, তখন লহনা ও খুল্লনা—দুই সপত্নীর মধ্যে প্রসাধনের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। তখন রমণীদ্বয়কে সাজাইবার জন্য—

"ডানি করে নিল রামা রজতের ঝারি।
বাম করে নারায়ণ তৈল বাটী পূরি॥"

পরিচারিকা নিপুণহস্তে—বিরহিণীর মাথায় নারায়ণ তৈল ঢালিয়া দিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছিল।

"রুক্ষকেশে নারায়ণ তৈল এক বাটী।
কবরী বান্ধিল রাখা নাম গুয়ামুটী।"

কবিকঙ্কণের অনেক স্থানেই "নারায়ণ তৈলে"র উল্লেখ আছে, ইহাতেই মনে হয়, 'নারায়ণ তৈল' তখন নারীদের প্রসাধানের এক প্রধান সহায় ছিল। তাঁহারা নারায়ণ তৈলের গুণ জানিতেন। "মনসার ভাসানে"ও নারায়ণ তৈলের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

"হরিদ্রা বাটিয়া দিল মাথাইয়া গায়।
নারায়ণ তৈল দিল বেহুলার মাথায়॥"

বৈষ্ণব কবিও লিখিয়াছেন—

'নারায়ণ তৈল দিয়ে যত সহচরী।
বান্ধি দিল শ্রীমতীর মোহন কবরী॥"

পাঠক! বলিতে পারেন, সেকালের নারীগণ কেন নারায়ণ তৈলের এত আদর করিতেন? নারায়ণ তৈল যে শুধু কেশ পোষক, তাহা নহে। যে হিন্দু রমণী মাতৃত্ব লাভকে জীবনের চরম সার্থকতা মনে করেন, যাঁহাদের প্রাণের উদ্দেশ্য—

"কাণা খোঁড়া পুত্র হ'ক তবু দুঃখ ঘোচে।"

'নারায়ণ তৈল'ই তাঁহাদের নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন। সেকালের হিন্দু সতী-সৌভাগ্যবতী হইবার কামনায় মাথায় নারায়ণ তৈল মাখিতেন। বৈদ্যক গ্রন্থে যখন নারায়ণ তৈলের ফলশ্রুতি পড়ি—

"বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রং বীরোপমং সর্ব্বগুণোপ পন্নম্।" তখনই বুঝিতে পারি—নারীর সহিত নারায়ণ তৈলের কি পবিত্র সম্বন্ধ! যখন দেখি,—শাস্ত্রকার জোর করিয়া বলিতেছেন,

গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী তথা।
অল্প প্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
এতত্তৈল বরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতং'

তখনই বুঝিতে পারি—সেকালের পতিব্রতা সুন্দরীগণ কেন নারায়ণ তৈল মাখিয়া স্বামী-সোহাগিনী হইতে চাহিতেন।

এখন আমরা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর শিখিয়াছি। বিলাসের মোহে—সুগন্ধের প্রলোভনে—বাজে তৈল কিনিয়া গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। আমরা ভাবিবার অবকাশ পাই না—ইহাতে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে! আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা,—যে গৃহে "নারায়ণের" মহিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে গৃহে লক্ষ্মীর পূজা নিতান্তই দুরাশা! আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি—নারায়ণ তৈলের প্রসাদেই আমার কন্যা সুকেশী হইয়া স্বামী সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। হৃদয়ের আবেগে কথাটা আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

নাভি কাহাকে বলে ?

ঘটনা—চারিবৎসর পূর্ব্বের। আমারই পাড়ার এক ভদ্রলোকের উদরাভ্যন্তরে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল, একজন বড় ডাক্তারের সহকারী রূপে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্থির হয়—ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া রোগির নাভির পার্শ্বে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলাম।

কিন্তু প্রথমেই এক বিড়ম্বনা—বাটীর গৃহিণী সেকেলে লোক, তিনি একজন কবিরাজকে ডাকিয়া আনাইয়া ছিলেন। কবিরাজ যখন শুনিলেন—রোগির নাভি ছেদন করা হইবে, তখন তিনি ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহার কথায় ডাক্তার বাবু যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কবিরাজ তখন বাটী গিয়া একখানি পুঁথি লইয়া আসিলেন। পুঁথি খানির নাম—"সুশ্রুত সংহিতা", বৈদ্যদের অস্ত্রচিকিৎসার স্মৃতি! সেই পুস্তক খানির "মর্ম্ম-নির্দ্দেশ" নামক অধ্যায়টী খুলিয়া, কবিরাজ মহাশয় আমাদের দেখাইলেন—

"পক্কামাশয়োর্মধ্যে শিরা-প্রভবা নাভির্নাম;
তত্রাপি সদ্য এব মরণম্।"

তাঁহার কথায় আমরা ইহার মোটা মুটি অর্থ এই বুঝিলাম, যে—পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তিস্থান নাভি নামক মর্ম্ম আছে, সেই নাভি আহত হইলে মানুষ সদ্যঃই মরিয়া যায়।

ডাক্তার বাবু একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন। দক্ষ হস্তে রোগীর নাভি ছেদন করিলেন। বেগতিক বুঝিয়া বৈদ্যবর গা' ঢাকা দিলেন। প্রায় ১ মাস শয্যাগত থাকিয়া রোগী বাঁচিয়া উঠিল। কবিরাজ মহাশয় ত অবাক্? "নাভি কাটিলে কি মানুষ বাঁচিয়া থাকে? বোধ হয় এই প্রশ্নই অতঃপর তাঁহার জপমালা হইল। ইহার উপর,—ডাক্তার বাবু একদিন আর একটু 'রসান্' চড়াইলেন—"কৈ, কবিরাজ মহাশয়! আপনার সুশ্রুতের কথা ত খাটিলনা! 'নাভি-মর্ম্ম' আহত হইয়াও রোগী যে বাঁচিয়া রহিল! আপনাদের শাস্ত্র ভুল!" কবিরাজ মহাশয় নতশিরে নিরুত্তর! তাঁহার এ মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা—আমার কিন্তু ভাল লাগিল না। আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণের সন্তান—আমার সম্মুখে ঋষি রচিত শাস্ত্রের নিন্দা, এ অপমান নিতান্তই অসহ্য। কিন্তু "ঋষি বংশধর" বলিয়া আভিজাত্যের গৌরব মনে মনে থাকিলেও, সে সময় শাস্ত্র-সমর্থনের কোন যুক্তিই আমার জানা ছিলনা। আমিও নীরবে বাটী ফিরিলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আমার "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি,—ঋষি বাক্য নির্ভুল; আমরা কুলাঙ্গার—শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই শাস্ত্রের নিন্দা করি। সে দিন কবিরাজ মহাশয় যে নাভিছেদনে বাধা দিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন,—ইহার কারণ তিনি শাস্ত্র বাক্যের নিগূঢ় অর্থ বুঝেন নাই বলিয়া। কবিরাজ মহাশয়েরা যত বড় বিদ্বান হউন, শারীর বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাদের শিক্ষা-গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যে শরীর,—চিকিৎসার ক্ষেত্র,

সেই শরীরের সকল রহস্য না জানিলে কি কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হওয়া যায়?

বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা বলি। নাভি অর্থে ঋষিরা কি বুঝিতেন? তন্ত্রশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—নাভি হইতে সমস্ত নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে, ঋষিরা ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব নাভি—নাড়ী চক্র। এ নাভি—চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতে পারেনা। 'নাভি' কি এবং তাহার অবস্থান কোথায়?—ইহা বুঝিতে গেলে, প্রথমে তন্ত্রশাস্ত্রের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, তন্ত্রে যাহা "মূলধার চক্র", আয়ুর্ব্বেদে তাহারই নাম "নাভি"। এক্ষণে বুঝা যাক্, "মূলধার" কি?

তন্ত্র বলেন—গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং মেঢ্র স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে মূলাধার পদ্ম বিরাজিত, উহার বিস্তৃতি চতুরংগুলি পরিমাণ। এই মূলাধারপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল আছে—যোগিগণ তাহাকে যোনি-মণ্ডল বলেন। এই যোনি-মণ্ডলের মধ্যপ্রদেশে—বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার সম্পন্ন সার্দ্ধ ত্রিবলয়া কায়া কুটিলা "কুলকুণ্ডলিনী" ব্রহ্মপথ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই ত্রিকোণ-যোনি হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। মূলাধার পদ্ম হইতে অন্য যে সকল নাড়ী উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী জিহ্বা মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন করিয়া, স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক আবার নিজনিজ উদ্ভবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে।

অন্যা যাস্বপরা নাড্যঃ মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা মেঢ্র বৃষণ্ পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাং।
কক্ষা নেত্রাঙ্গুষ্ঠ কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ু কুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্ততে যথাদেশ সমুদ্ভবা।

[শিব সংহিতা]

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে—মানব দেহস্থিত ইড়া-পিঙ্গলাদি সমস্ত নাড়ী মূলাধার পদ্মস্থিত "কুল কুণ্ডলিনী" হইতে উৎপন্ন। এই সকল নাড়ী—উদর প্রাচীরস্থ চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতে কখনই উৎপন্ন নহে।

সংস্কৃত ভাষায় চর্ম্মনির্ম্মিত নাভির নাম "নাভি" হইলেও, নাভি শব্দে—দ্রব্যের মধ্যস্থলকেও বুঝায়। যেমন "চক্রনাভি" বলিলে চক্রের মধ্যস্থল এইরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। সূর্য্য সৌর জগতের মধ্যে বিরাজমান,—তাই তিনি জগতের নাভি, অর্থাৎ Cantre. পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন—একখানা লৌহাকর্ষকের সংস্পর্শে আর একখণ্ড লৌহ "চুম্বকত্ব" প্রাপ্ত হয়। এইরূপ চুম্বকধর্ম্মী লৌহখণ্ড, আর একখণ্ড লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে। সকল লৌহেই চুম্বকের ধর্ম্ম আছে, কিন্তু সে শক্তি নিদ্রিত। এই নিদ্রার নাম "যোগনিদ্রা।" পরমাত্মরূপ চুম্বকের সংস্পর্শে প্রকৃতিরূপ লৌহখণ্ডে তিনটী শক্তি জাগ্রত হয়। তাই যোগবাশিষ্টে উক্ত হইয়াছে—

নিরিন্ধে সংস্থিতে বাস্ব যথা লৌহং প্রবর্ত্ততে।
সত্বামাত্রেণ দেবেন তথৈবেরং জগজ্জনী।

অক্ষোভিত অবস্থায় এই তিন শক্তি যোগ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। পরমাত্মার চৈতন্যে চৈতন্যবতী হইয়া প্রকৃতি জীব দেহে তিনভাবে ক্রিয়া করেন। চুম্বকের দুই সীমায় লৌহা-

কর্ষণ শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু উহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির সত্ত্বা নাই। এইরূপ লৌহাকর্ষণ-শক্তিবিহীন-মধ্যস্থল না থাকিলে, চুম্বকের উভয় প্রান্ত কখনও লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না।

জগতের অন্যান্য শক্তিগুলিও একটী স্থির মধ্যস্থল না পাইলে, কার্য্য করিতে পারেনা। মানব-দেহে যে জীবনী-শক্তি ক্রিয়া করে—সেও চুম্বকের মত মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া। এই স্থির মধ্যস্থল না থাকিলে, মানব-শরীরে কোন জীবনী শক্তিরই বিকাশ ঘটিত না।

এক্ষণে দেখা যাউক মানব-দেহের এই স্থির মধ্যস্থল কোথায় ?

তন্ত্র বলেন—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাড়ী স্থাহিস্বরূপিনী।
ততোদশোর্দ্ধগা নাড্যো দশশ্চাধো গতা স্তথা।
তির্য্যগ্ গতে জ্ঞেয়া নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া।

অহি স্বরূপিণী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে ২৪ টী প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টী উর্দ্ধগ ১০টী অধোগ এবং বামে ও দক্ষিণে দুইটী দুইটী করিয়া চারিটী নাড়ী তির্য্যগ্‌গামী।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

চতুর্ব্বিংশতি ধমন্যো নাভি প্রভবা অভিহিতাঃ। তাসাস্তু নাভি প্রভবানাং ধমনীনা মূর্দ্ধগা দশ দশশ্চাধোদামিন্যঃ চতস্র স্তির্য্যগ্‌গাঃ

[শা, ৯ম অঃ]

আবার "শিব-স্বরোদয়" নামক তন্ত্রে দেখা যায়—নাভিকন্দ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ৭২০০০ সহস্র ধমনী নির্গত হইয়াছে। নাভিস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে ১০টী উর্দ্ধগ, ১০টী অধোগ, এবং ৪টী তির্য্যগগত, এই ২৪টী নাড়ী প্রধান।

তান্ত্রিক মূলাধারস্থ ত্রিকোণের আর একটী নাম দিয়াছেন—"কূর্ম্ম"। দত্তাত্রেয় বলেন—

তির্য্যক কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্তৃং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
উর্দ্ধ ভাগে হস্ত পাদৌ চ যামৌ
তস্যাবিস্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥
বক্তে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ।

শঙ্কর সেন তাঁহার 'নাড়ী প্রকাশে'—এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বৈদ্যগণকে এক "গোলোকধাঁধায়" ফেলিয়া দিয়াছেন। দেহিদিগের নাভিদেশে তির্য্যগ্‌ভাবে একটী কূর্ম্ম আছে, তাহার মুখ নাভিদেশের বাম ভাগে, পুচ্ছ দক্ষিণভাগে, উর্দ্ধভাগে তাহার বাম হস্ত ও বাম পদ এবং অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ। ঐ কূর্ম্মের মুখে দুইটী নাড়ী পুচ্ছদেশে ২টী নাড়ী এবং পদদ্বয় ও হস্তদ্বয়ে ৫টী ৫টী করিয়া ২০টী—সর্ব্বসমেত ২৪টী নাড়ী আছে।

এই শ্লোকে রূপকচ্ছলে যে ত্রিকোণযোনি হইতে ২৪টী ধমনীর উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে—শঙ্কর সেন ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং কেবলমাত্র "নাড়ী-প্রকাশ" পাঠে—কূর্ম্মের প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়না। মানবদেহে বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখদিকে এবং ত্রিকাস্থি (Sacrum) পশ্চাদ্দিকে এই অংশই দেহের মধ্যস্থল বা নাভি। সুতরাং সুশ্রুত বর্ণিত নাভিমর্ম্ম—চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতেই পারে না। চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি আহত হইলে কাহারও সদ্যঃ মরণ হয় না। উদর মধ্যস্থিত আমাশয় ও পক্বাশয়—যে স্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রস বহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে—সেই স্থানই সুশ্রুতোক্ত "নাভিমর্ম্ম"। এই

নাভিমর্ম্মে আঘাত লাগিলে—মানুষের সদ্যঃই প্রাণবিয়োগ ঘটে। এই নাভিই প্রাণের আশ্রয় স্থল। ভ্রূণের দেহ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডের (Ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীক্রিয়া প্রথম বিকাশ পায়, মস্তিষ্ক হস্ত পদাদি ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়। দেহের নাভি বা মধ্যস্থল জীবনীশক্তির প্রধান স্থান। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord) এই নাভিস্থ প্রাণ দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বটবৃক্ষের অতি সূক্ষ্ম বীজে বটবৃক্ষ সৃজন করিবার শক্তি থাকে, তেমনই মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডে মানব-দেহ সৃজন করিবার শক্তি সূক্ষ্ম ভাবেই নিহিত থাকে। বটগাছ যেমন কাণ্ড-শাখা ও পত্র-পল্লবে ক্রমশঃ ভূষিত হইয়া থাকে, —জীবনীশক্তি ও ক্রমশঃ সমগ্র বৃক্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; মাতৃগর্ভস্থ অণ্ডেও তেমনি ভ্রূণ দেহের জীবনীশক্তি অণুর অণু ভাবে লুক্কায়িত থাকে। এই শক্তিই শ্রুতির সেই—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

সর্ব্বজ্ঞ ঋষি তাই নাভিমর্ম্মকে প্রাণের আশ্রয়স্থল বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা ঋষি বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই তাঁহাদের নিন্দা করি।

যেমন পদ্মের কন্দ পঙ্ক মধ্যে থাকে এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম জলের উপর ভাসে তদ্রূপ আর্য্য-শাস্ত্র মতে সমস্ত ধমনী নাভিকন্দ অর্থাৎ কটিদেশস্থ ত্রিকাস্থির (Sacrum) সম্মুখস্থ (Pelvicplexus) হইতে উৎপন্ন হইয়া উদরাভ্যন্তরস্থ (Solar Plexus) হইতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন –

"কন্দস্থানং মনুষ্যানাং দেহমধ্যান্নবাঙ্গুলং"

মূলাধার হইতে ৯ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধস্থিত স্থান অবধি সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান। যখন মানব দেহ প্রথম মাতৃগর্ভে গঠিত হয়, তখন জীবনী-শক্তির প্রথম বিকাশ নাভি প্রদেশে [অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগে] দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞতা বশতঃ অনেকে উদর-প্রাচীর স্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভিকে সমস্ত শিরার মূল বলিয়া থাকেন,—ইহা কিন্তু একেবারেই অসম্ভব। তবে চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভির ভিতর দিয়া ভ্রূণের নাভি রজ্জু (Umbilical cord) গমন করে বটে, কিন্তু ইহা কেবল মাতৃ-হৃদয়ের সহিত ভ্রূণের হৃদয় সংযোগের জন্য। বাগ্‌ভট এ কথাটী সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

গর্ভস্য নাভৌ মাতুশ্চ হৃদি নাভি র্নিবধ্যতে।
যয়া স পুষ্টি মাপ্নোতি কেদার ইব কুল্যয়া।

প্রকৃত পক্ষে নাভি—কেবল রক্ত চলাচলের জন্য নাভিরজ্জু যাইবার পথ মাত্র।

গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণের পর শিশুর কোন শিরাই চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভির সহিত সংযুক্ত থাকে না। শবব্যবচ্ছেদের দ্বারা বেশ বুঝা যায়—সমস্ত শিরাই উদর মধ্যস্থিত Solar Plexus এর সহিত নিবদ্ধ। এই Solar Plexus হইতে শাখা-প্রশাখা অন্যান্য Plexus এর সহিত সংযুক্ত হইয়া শরীরের সমস্ত শিরাজালের প্রাচীর ব্যাপিয়া আছে। Solar শব্দের অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধীয়, আর্য্য ঋষিগণও নাভিকে সূর্য্যস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তন্ত্র—এ সকল কথা ভাল রকমই বুঝাইয়াছেন। আমাদের দুইটী কেন্দ্র,—ঊর্দ্ধকেন্দ্র অর্থাৎ মস্তক চন্দ্রের স্থান, অধোকেন্দ্র অর্থাৎ নাভিদেশ সূর্য্যের স্থান।

"তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ নাভিমূলে দিবাকরঃ"

নাভি যেমন সমস্ত ধমনীর উৎপত্তি স্থান, তেমনি সমস্ত শিরারও উৎপত্তি স্থান।

যে শক্তি Solar Plexus প্রক্রিয়া করে—তাহাই আয়ুর্ব্বেদের সমান বায়ু। এই বায়ু অন্নপরিপাকের সাহায্য করে, এবং পরিপাক প্রাপ্ত অন্নের সারাংশ (রস) আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে প্রেরণ করে। বৃক্ষ যেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ জীবনী শক্তির প্রভাবে মানব দেহে আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে রস দুইটী মার্গ দিয়া হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া শরীরকে পোষণ করে। যে রস দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ—সেই রস Lactial নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম রস বহা শিরার দ্বারা শরীরের বাম ভাগস্থিত Tharacic cluct নামক শিরা দিয়া বক্ষের ভিতরে রক্তের সহিত হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এবং আহারের সারাংশ রসের কিয়ৎ পরিমাণ আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা দিয়া Portal vein শিরায় প্রবেশ করে। ইহাই হইতেছে—রস প্রবাহের দক্ষিণ মার্গ। Portal vein হইতে এই রস যকৃতে যায়। তাহার পর যকৃতের মধ্যে সংশোধিত হইয়া হৃদয়ে গমন করে। ইহার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ মতের আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে রসের হৃদয় পর্য্যন্ত গমন—অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইল। এই আমাশয় ও পক্কাশয়ের প্রাচীরে যে সূক্ষ্ম Lactial ও Portal vein এর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ আছে, তাহাই রস ও রক্তবহা শিরা সমূহের উৎপত্তি স্থান। এই জন্যই অসাধারণ মনীষী সুশ্রুত বলিয়াছেন—"তাসাং নাভিমূলং ততশ্চ প্রসরন্ত্যূর্দ্ধমধস্তির্য্যক্ চ।" নাভিই শিরা সমূহের মূল, শিরাগণ তথা হইতেই ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে। সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন—

যাবত্যস্ত শিরাঃকায়ে সম্ভবন্তি শরীরিণাং
নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ
প্রাণান্নাভির্ব্যপাশ্রিতাঃ
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভি রিবারকৈঃ॥

দেহীগণের দেহে যতগুলি শিরা উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই নাভির সহিত নিবদ্ধ, নাভি হইতেই তাহারা সর্ব্বশরীরে প্রসারিত হইয়াছে। প্রাণীগণের প্রাণ নাভিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আবার নাভিও প্রাণকে অবলম্বন করিয়া আছে। যেমন চক্রনাভি, চক্র সমূহ দ্বারা বেষ্টিত। চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভির সহিত কোন শিরাই নিবদ্ধ থাকেনা। সুতরাং প্রাণীর প্রাণ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভিকে আশ্রয় করিয়া থাকেনা। অতএব নাভি অর্থে দেহের মধ্যস্থল—ঋষি উক্তির ইহাই অভিপ্রায়। দেহের মধ্যস্থল কটিদেশে, এই কটি দেশেই মূলাধার চক্র অবস্থিত; সেই চক্রের মধ্যে মহার্শক্তি কুণ্ডলিনী বিরাজিত। ইহাই নাভিকন্দ। এই কুণ্ডলিনীর প্রভাবেই Solar Plexus হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে।

শার্ঙ্গধরও বলিয়াছেন,—

নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃৎকমলান্তরং।
কণ্ঠাদ্বহি র্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণু পদামৃতং।
পিত্বাচাম্বর পীযূষং পুণরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়ন্ দেহ মখিলং জীবয়ন্ জঠরানলম্॥

অর্থাৎ নাভিস্থ প্রাণবায়ু হৃদয়াভ্যন্তর [Chest] দিয়া গমন করিয়া বিষ্ণুপদামৃত (বাহ্যবায়ু) পান করিবার আশায় কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় এবং আকাশ পীযুষ পান করিয়া সমস্ত শরীরকে তর্পিত ও জঠরানলকে বর্দ্ধিত করিয়া নাসিকায় রন্ধ্র পথে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

আয়ুর্ব্বেদ-রচয়িতৃগণ কাহাকে নাভি বলিয়াছেন, এতক্ষণে পাঠকগণ তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব নাভি যে কেন সমস্ত ধমণীর উৎপত্তিস্থান—নিম্নলিখিত যুক্তির বলে আমরা সেই ঋষিবাক্য সমর্থন করিতেছি।

(ক) জীবনী শক্তির প্রথম বিকাশ হয়—দেহের মধ্যস্থল হইতে। জননীর জরায়ুস্থ শিরার সহিত ভ্রূণের নাভি রজ্জুর যে সংযোগ—তাহাই জীবনী শক্তির প্রথম ক্রিয়া।

(খ) Solar Plexus হইতে vasomodor ধমণী সমূহ সকল শরীরে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পোষণ অভাবে কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। শরীরের বিস্তৃতির সহিত রসবহা শিরাগুলিও বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই সকল শিরায় প্রাচীরে Varomodor ধমনী জাল আকুঞ্চন ও প্রসারণের কার্য্য করে। এই ধমনীগুলি উদরাভ্যন্তরস্থ Solar Plexus এর সহিত সংযুক্ত বলিয়া, শিরা ও ধমনী সমূহকে নাভি নিবদ্ধ বলা যায়।

(গ) সুশ্রুতোক্ত নাভি-মর্ম্ম কখনই চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি হইতে পারেনা। কেননা চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি ছেদন করিলে মানুষ কখনই মরে না।

(ঘ) উদরের অভ্যন্তরে আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যে যে শিরাজাল আছে,—সেই শিরাজাল বেষ্টিত স্থানের নামই নাভিমর্ম্ম। এই স্থানে সামান্য মুষ্ট্যাঘাত করিলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা।

(ঙ) পৌরাণিক উপাখ্যানে আমরা জানিতে পারি,—বিষ্ণুর নাভি হইতে হংসবাহন ব্রহ্মার উৎপত্তি। ভ্রূণের মধ্যদেশ হইতে সমস্ত দেহই সৃজিত হয়। হংস অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস (হং—নিশ্বাস, স—উচ্ছ্বাস) অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ভ্রূণের দেহের মধ্যস্থলেই শ্বাস প্রশ্বাস বা প্রাণের বিকাশ স্থান।

ডাক্তার—
শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, বি।

আয়ুর্ব্বেদের কষায়-মাহাত্ম্য।

দুরালভা-কষায়।

“পিবেদ্ দুরালভা-ক্বাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।” দুরালভার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

ভ্রম-রোগটা কি, তাহা আগে বুঝা যাউক, পরে কষায়ের প্রস্তুতি-বিধি প্রভৃতি বলা যাইবে।

প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে অন্যান্য রোগের ন্যায়, ভ্রম-রোগের নিদানাদি তত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত নাই। “নিদানে মাধবঃ শ্রেষ্ঠঃ।” কিন্তু মাধব করও স্বকীয় রোগবিনিশ্চয় সংগ্রহে, “রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ” সুশ্রুতোক্ত এই বাক্যটী উদ্ধার করিয়া নিরস্ত রহিয়াছেন,—লক্ষণ বলেন নাই। নিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয় রক্ষিত, মাধব নিদানে ভ্রম-রোগের

লক্ষণ না বলার সপক্ষে একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, "নিদ্রা ভ্রময়োস্তু লক্ষণং নোক্ত মিহাতি প্ররিদ্ধত্বাৎ।" অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, নিদ্রার লক্ষণ এবং ভ্রমরোগের লক্ষণ এখানে উক্ত হয় নাই। কিন্তু টীকাকার, "ভ্রমলক্ষণন্তু চক্রস্থিতস্যেব ভ্রমবদ্বস্তু দর্শনম্" অর্থাৎ ভ্রমমান চক্রেস্থিত বস্তু দর্শনের ন্যায় বস্তু দর্শনই ভ্রমরোগের লক্ষণ, এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বলিয়া রোগের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু রোগ-চিকিৎসার পক্ষে এরূপ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ পর্য্যাপ্ত নহে। রোগের নিদানাদি তত্ত্ব না জানিলে, সুচারুরূপে রোগ চিকিৎসা করা চলেনা। তজ্জন্য সংক্ষেপে ভ্রম রোগের নিদান, পূর্ব্বিকা, সম্প্রাপ্তি এবং লক্ষণ বলা যাইতেছে।

অনবস্থান বা ভ্রমনার্থক ভ্রম্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অল্ বিধান করিলে 'ভ্রম' শব্দ সিদ্ধ হয়। করণায়তন বা মনোভূমি (Brain) অনবস্থিত হইলে অর্থাৎ সুস্থিত না রহিয়া বিচলিত হইতে থাকিলে ভ্রমরোগ উৎপন্ন হয়।

ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা—এই চারি দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। যে দ্রব্যে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে, ন্যূনাতিরেক মাত্রায় স্নেহ বিদ্যমান থাকে, তাহাকে স্নিগ্ধ দ্রব্য বলে। অস্নিগ্ধ দ্রব্যের নাম রুক্ষ দ্রব্য।

রুক্ষ ভোজন, মাদক সেবন, ধাতুক্ষয় বিশেষতঃ মজ্জ-ধাতুর ক্ষীণতা, উৎকট চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, মস্তকে ভারবহন, অতি মাত্রায় রৌদ্রাগ্নির সন্তাপ গ্রহণ, এবং অতি-ব্যায়াম প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত এবং রজঃসংজ্ঞক মানস দোষ-প্রকুপিত হইয়া যদি উত্তমাঙ্গ আশ্রয় করে, তাহা হইলে দোষ ত্রয়ের রুক্ষোঞ্চ-চাঞ্চল্য গুণে মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা এবং সুস্থিরতা হ্রাস পাইতে থাকে। তজ্জন্য মনঃ অপ্রসন্ন ও ও চঞ্চল হইয়া উঠে, মুখমণ্ডল ম্লান-শ্রী ধারণ করে, ভালরূপ নিদ্রা হয় না, অথবা আদৌ ঘুম আসে না এবং শরীর খুব গরম বোধ হইতে থাকে। এই সময়ে নিদান পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সাবধান না হইলে ভ্রম রোগ উপস্থিত হয়।

মাথাঘোরা এবং গা-টলা ভ্রমরোগের প্রতিনিয়ত লক্ষণ। হৃৎস্পন্দন, বিবমিষা, বমন, চিত্তের অস্থিরতা, মুখশোষ এবং অরুচি প্রভৃতি এই রোগের অপরাপর লক্ষণ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ ভ্রমরোগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকেনা। কিন্তু ভ্রম-রোগগ্রস্থ ব্যক্তির শরীর কোন সময়েই স্বচ্ছন্দ লাভ করেনা। কাল বা অপর হেতু বশতঃ দোষ-লব্ধ-বল পীড়া প্রকাশ পায়। দোষের প্রকোপ প্রশমিত হইলে, রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করে। কাহারও বা ন্যূনাতিরেক পরিমাণে সর্ব্বক্ষণই পীড়া বিদ্যমান থাকে। বসিয়া সুস্থির থাকিলে কিংবা স্থিরভাবে শুইয়া রহিলে, রোগী কিছু স্বস্তি বোধ করে; হঠাৎ আসন-শয়ন ত্যাগ করিলে মাথা ঘুরিয়া আইসে। যখন পীড়া প্রবল হয়, তখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠে। বোধ হয় যেন, ব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। এই সময়ে উপযুক্ত উপাধানে মাথা রাখিয়া, চোক বুজিয়া শয়ন করিলে এবং মাথা চাপিয়া রাখিলে কিছু ভাল বোধ হয়। চোক মেলিয়া চাহিলে এবং মাথা ঘুরাইলে-ফিরাইলে পীড়া বৃদ্ধি পায়।

ভ্রমরোগ, কথন-কথন অন্যরোগের লক্ষণরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। বিদগ্ধাজীর্ণ, বাতপিত্তজ্বর এবং শ্রবণ ও নয়ন রোগ বিশেষে

ভ্রম উপস্থিত হয়। এরূপ ভ্রমকে লাক্ষণিক ভ্রম বলা যাইতে পারে। ভ্রমরোগ কখন-কখন অন্য রোগের উপদ্রবরূপেও আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। ভ্রম বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগের অন্যতম উপদ্রব।

দুরালভা,—দুরালভা বহুকণ্টকাকীর্ণ ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ্। উত্তর-পশ্চিম-বঙ্গের এবং ভারতের অন্যান্য উচ্চপ্রদেশের প্রান্তরে বহু পরিমাণে দুরালভা জন্মিয়া থাকে। নিম্ন বঙ্গে জন্মে না। কিন্তু কুত্রাপি দুরালভা অসুলভ নহে। সর্ব্বত্রই পশারির দোকানে আবশ্যকানুরূপ দুরালভা কিনিতে পাওয়া যায়। হিন্দি ভাষায় এই গাছের নাম জবাসা ও দুরালা।

অযত্নে রক্ষিত, চিরকালোষিত, ভ্রষ্টবর্ণ, গতরস এবং হতবীর্য্য কোন ওষধিই ঔষধার্থে ব্যবহার করা উচিত নহে। টাট্‌কা অথচ শুষ্ক দুরালভা সংগ্রহ করিয়া, ধুইয়া ধূলি-বালি ছাড়াইয়া শুকাইয়া লইবে। তার পর কুটি-কুটি করিয়া কাটিয়া, উদূখলে বা হামানদিস্তায় উত্তম রূপে কুটিয়া লইবে। কুট্টিত দুরালভা ২ ভরি ওজন করিয়া লইয়া মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে, আধসেরের জল সহ ধীরে ধীরে পাক করিবে। আধপোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া পরিষ্কার পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে অর্দ্ধ তোলা পুরাতন গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রাখিবে। ঘৃত গলিয়া গেলে এবং কষায় শীতল হইলে এক মাত্রায় পান করিবে। পুরাতন ঘৃতের অভাব হইলে টাট্‌কা গব্য ঘৃত অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

তরুণ এবং অবৃদ্ধ ভ্রম-রোগে, উক্ত নিয়মে দুরালভার কাথ তৈয়ার করিয়া ৫।৭ দিন ব্যবহার করিলে ভ্রম রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। পুরাতন ভ্রম রোগে ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, যে কারণে ভ্রম রোগ জন্মে, যত্নপূর্ব্বক সেই সেই কারণ পরিবর্জ্জন করিয়া কষায় সেবন করা উচিত।

কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
কবিরত্ন।

শার্ঙ্গধরোক্ত প্রলেপাবলী।

বিষঘ্নলেপ।

ঈশলাঙ্গলা, আতইচ, তিতলাউ বীজ,
কাঁজীতে পেষণ করি ঝিঙ্গা মূলাবীজ।
প্রলেপন দিলে কোঠ আর বিস্ফোটক।
বিনাশ হইবে ইহা জানিবে ভিষক॥

বন্যলেপ।

টাবালেবুমূল, ঘৃত, মনছাল আর,
গোময়ের রসে লেপ করিবে যাহার।
নীলিকা, পিড়কা, ব্যঙ্গ তার নাশ হবে,
বিশেষ মুখের কান্তি সদা তা'র রবে।

বয়োব্রণে লেপত্রয়।

(১)

লোধ, ধনে, বচ দ্বারা করিলে প্রলেপ;
তথা গোরোচনা আর মরিচের লেপ,
সর্ষপ, বচ ও লোধ, সৈন্ধব লবণ
যৌবন পিড়কানাশে করিলে লেপন।

(২)

অৰ্জ্জুনের ছাল কিম্বা মঞ্জিষ্ঠা পেষিত,
সংযুক্ত করিয়া তাতে মধু, নবনীত।
অথবা শ্বেতাশ্বখুর ভস্ম তথা করি।
প্রলেপ করিলে ব্যঙ্গরোগ যায় সরি॥

(৩)

আকন্দর আঠা আর হরিদ্রা মৰ্দ্দিত,
প্রলেপনে মুখকাণ্ড্য হয় প্রশমিত॥
বঁটের কোমল পত্র, মালতী, চন্দন,
কুড় ও দারু হরিদ্রা, লোধ বিলেপন
করিলে নীলিকা, ব্যঙ্গ, বয়োব্রণ নাশ।
শার্ঙ্গধর গ্রন্থে ইহা হইল প্রকাশ॥
তিলের খইল আর কুক্কুটের মল,
গোমূত্রে পেষিয়া লেপ অরুংষি কাজল।
খদির, নিম ও জাম ইহাদের ছাল,
গোমূত্রে পেষণ করি লেপ দিলে ভাল,
কিম্বা কুড়চীর ছাল সৈন্ধবে তেমন
প্রলেপনে আরুংষিকা হয় প্রশমন॥
সৈন্ধব, পিয়ালবীজ, কুড়, যষ্টিমধু,
বাটিয়া মাষকলাই, যুক্ত করি মধু,
মস্তকে প্রলেপ দিলে নাশে দারুণক।
তথা পোস্তদানা দুগ্ধে হয় বিনাশক॥
আম্রবীজ হরীতকী করিয়া চূর্ণিত,
দুগ্ধেতে পেষিয়া লেপে উহা প্রগমিত।
তিক্ত পটোলের পত্র রসের লেপন,
তিন দিনে ইন্দ্র লুপ্ত হয় প্রশমন।
বৃহতীর রসে মধু সংযোগ করিয়া
লেপ দিলে টাকপড়া যাইবে সরিয়া।
গুঞ্জার মূল বা ফল, ভেলারস কিবা
গোক্ষুর ও তিলফুল, সম অংশে নিবা
ঘৃত মধু মস্তকেতে করিলে লেপন।
কেশ বৃদ্ধি হয় তার কহে বুধগণ॥

ছাগদুগ্ধে হস্তিদন্ত ভস্ম, রসাঞ্জন,
পেষণ করিয়া যদি করে বিলেপন;
হাতের তলেও তাতে রোমোৎপন্ন হয়।
টাক বিনাশিবে তার কি আছে সংশয়।
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দ্রাক্ষা, তৈল, ঘৃত
দুগ্ধপেষি লেপ দিলে টাক প্রশমিত।
বিশেষত কেশ সব ঘন দৃঢ় হয়।
অপর রোমসকম শ্রেষ্ঠ অতিশয়
চতুষ্পাদজন্তুদের রোম, নখ, ত্বক্,
শৃঙ্গ, অস্থিভস্ম, তৈলে মৰ্দ্দিয়া ভিষক
তদ্দারা প্রলেপ দিলে রোমোৎপন্ন হয়।
রোমসজনক ইহা শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥
রাখাল শশার বীজ তৈলে বিমৰ্দ্দিয়া
মাখিলে হইবে কেশ ভ্রমর নিন্দিয়া॥
লৌহচূর্ণ, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও মাটি,
একমাস ইক্ষুরসে রাখিবেক খাটি;
তদ্দারা প্রলেপ দিলে জানিবে নিশ্চয়।
অকাল পলিত কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়॥
আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এ তিন,
ক্রমে সংখ্যা তিন, দুই, একটি প্রবীন।
আমের আটীর মজ্জা পাঁচটি লইবে।
লৌহচূর্ণ দুই তোলা একত্র পেষিবে।
লৌহপাত্রে এক রাত্রি করিয়া স্থাপন
লেপে কৃষ্ণ পক্ক কেশ কৃষ্ণ-ভ্রমর বরণ॥
ত্রিফলা ও নীলপত্র, লৌহচূর্ণ আর,
ভীমরাজ সমভাগে পেষিয়া আবার
ছাগমূত্রে, তাহা দ্বারা করিলে লেপন
কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় শ্রেষ্ঠ একারণ॥
ত্রিফলা, দাড়িমত্বক, পদ্মের মৃণালে।
লৌহ প্রত্যেকের চূর্ণ পাঁচপল তলে।
চারিসের ভীমরাজ রসে নিমজ্জিয়া।
একমাস লৌহপাত্রে রাখিবে পুঁতিয়া॥

পরে ছাগদুগ্ধে তাহা করিয়া মিলন।
রাত্রিকালে কূর্চ্চে, শিরে করিয়া মর্দ্দন॥
এরণ্ড পত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া
নিদ্রা যাবে, প্রাতে স্নান করিবে উঠিয়া
এইরূপ তিন দিন করিলে লেপন।
নিশ্চয় পলিত কেশ হবে প্রশমন॥

নেত্র।

হরীতকী, গেরিমাটী, সৈন্ধব, রসাঞ্জন,
এই সব দ্রব্য জলে করিয়া পেষণ।
নেত্রে বহির্লেপ ইহা করিলে প্রদান।
সর্ব্ব নেত্ররোগ ধ্রুব হবে অন্তর্ধান॥
ত্রিকটু ও রসাঞ্জন সলিলে পেষিয়া।
বটিকা প্রস্তুতকরি, জলে তা ঘসিয়া,
নেত্রে লেপে, কণ্ডূপাক অন্বিত অঞ্জন।
নেত্ররোগ ইহা হ'তে হয় প্রশমন॥
সোমরাজী-চাকুন্দের বীজ, তিল, কুড়,
সর্ষপ, হরিদ্রাদ্বয়, মুতা করি চুর,
তক্রেতে পেষণ করি লেপ দিলে তার।
কণ্ডূ, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা হইবে সংহার॥
বিড়ঙ্গ, হিঙ্গুল, হেমক্ষীরী ও গন্ধক;
চাকুন্দের বীজ, কুড়, সিন্দূর ভিষক,
পৃথক্ পৃথক্ নিম ধুতুরাপাতার,
পানের রসেতে মর্দ্দি লেপ দিলে তার॥
পামা, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডূ, কুষ্ঠরোগ।
(রকসা) বিনাশে আশু—নাহি হয় ভোগ!
দূর্ব্বা, হরীতকী আর চাকুন্দে সৈন্ধব,
অরণ্যতুলসী, তক্রে পেষি এই সব;
তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে কণ্ডূ, দদ্রু দ্বয়।
বিনাশ হইবে তাতে নাহিক সংশয়॥
শঙ্খচূর্ণ দুই ভাগ, এক হরিতাল।
সর্জ্জিক্ষার তথা, অর্দ্ধভাগ মনছাল।
এই সব দ্রব্য জলে করিবে পেষণ।
কেশ কামাইয়া উহা করিবে লেপন।
সাত লেপে এইরূপ ক্ষপণের ন্যায়।
নির্ম্মূলিত কেশ-শির দেখিবেক তায়॥
হরিতাল, পলাশের ক্ষার দুইখান।
শঙ্খচূর্ণ ছয়মাণ, (ত্রিভরি প্রমাণ)॥
কলার থোড়ের রসে, আকন্দপাতার
রসে মর্দ্দি কিম্বা, লেপ দিলে সাতবার
রোম সব উঠে যায়, শ্রেষ্ঠ অতিশয়
রোম কেশ উৎপাটনে ইহাই নিশ্চয়।
পীতবর্ণ হীরাকস, স্বর্ণ গৈরিক,
বিড়ঙ্গ ও মনছাল, গোরচনা ঠিক,
সৈন্ধব, এসব দ্বারা করিলে লেপন।
শ্বিত্র কুষ্ঠ রোগ আশু হবে প্রশমন।
কাকঠুটা, চাকুন্দের বীজ আর কুড়।
পিপুল, গোমূত্র লেপে শ্বিত্র হবে দূর॥
সোমরাজী বীজ, লাক্ষা, বায়সডুমুর,
পিপুল, অম্লবেতস, তিল, লৌহচুর,
রসাঞ্জন এই সব গোপিত্তে পেষিয়া।
গুটীকরি লেপে শ্বিত্র যাইবে সরিয়া।
আমলকী, যবক্ষার, ধুনাচূর্ণ করি।
সৌবীরের সহ লেপে সিধ্মরোগ হরি॥
দারু হরিদ্রা, মূলাবীজ, হরিতাল, পান।
দেবদারু প্রতি চূর্ণ দুই তোলা মান;
শঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা সলিলে পেষণ
করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম প্রশমন।
বেণামূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, চন্দন,
নখী, নীলোৎপল দুগ্ধে করিয়া পেষণ,
রক্তপিত্ত, শিরোরোগে লেপ দিলে তার,
আশু সেই রোগ হ'তে লভে প্রতিকার।
হরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, চাকুন্দে ও কুড়।
তিল, কটু তৈল লেপে উদর্দ্দাঙ্গ দূর।
দেবদারু, নীলোৎপল, রাস্না ও চন্দন,
বেড়েলা ও যষ্টিমধু সদুগ্ধে পেষণ,

ঘৃতযুক্ত করি লেপ করিলে তাহার।
বাত বীসর্প নাশ হয় কহিলাম সার।
পদ্মের মৃণাল, লোধ, চন্দন, কমল,
অনন্ত-বেণার মূল আর নীলোৎপল,
আমলকী, হরীতকী করিয়া মিলন।
প্রলেপে পিত্ত বীসর্প হয় প্রশমন॥
ত্রিফলা ও পদ্মকাষ্ঠ, বরাক্রান্ত আর।
করবী, অনন্ত, বেণা, নলমূল চার,
ইহাদের প্রলেপন করিলে প্রদান।
শ্লেষ্মজ বীসর্প রোগ হয় অন্তর্দ্ধান॥
জটামাংসী, ধুনা, লোধ, মূর্ব্বা, নীলোৎপল
রেণুক ও যষ্টিমধু, শিরীষ, কমল,
পিষে শত-ধৌত ঘৃতে করিলে লেপন।
পিত্তজাত বাত রক্ত হয় প্রশমন॥
আমলকী ঘৃতে ভাজি, কাঁজীতে পেষিয়া
শিরোলেপে নাসাস্রাব যাইবে সারিয়া
কাঁজীতে পেষণ করি মুচুকুন্দ ফুল,
এরণ্ডের তৈলে কিম্বা পেষিত থাকুড়,
তদ্দারা প্রলেপ দিলে অনিলজনিত।
মস্তক বেদনা আশু হয় প্রশমিত॥
তগরপাদুকা কুড়, দেবদারু আর,
বেণামূল, শুঁঠ; পিষি কাঁজীতে ইহার
লেপ দিলে তৈল আদি স্নেহযুক্ত করি
বাতজ মস্তক পীড়া শীঘ্র যায় সারি।
আমলকী, বাত,, পদ্ম, কেশুর, চন্দন,
পদ্মকাষ্ঠ, দূর্ব্বা-বেণা-নলমূলগণ;
এদের প্রলেপে পিত্তশিরঃ পীড়া হরে।
বিশেষত রক্তপিত্ত রোগও দূর করে॥
রেণুক, তগর পাদুকা শৈলজ, অগুরু,
মুতা, এলা, জটামাংসী, রাস্না, দেবদারু,
এরণ্ড মূলের লেপ সুখ উষ্ণ করি।
দানিলে বাতজ রোগ যাইবেক সারি॥
দেবদারু, গন্ধতৃণ, শুঁঠ, কুড়, আর
চাকুন্দ; গোমূত্রে পেষি ঈষদুষ্ণ তার।
প্রলেপ প্রদানে আশু কহে বুধগণ।
শ্লেষ্মজাত শিরঃপীড়া হয় প্রশমন।
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, বট ও পিপুল,
কাঁজীতে পেষণ করি কুড়ানন্তমূল,
স্নেহাভ্যক্ত করি তাহা করিলে লেপন।
আধকপালে, সূর্য্যাবর্ত্ত হয় প্রশমন॥
শতমূলী, নীলোৎপল, দূর্ব্বা, পুনর্নবা।
কৃষ্ণতিল; শঙ্খানন্ত বাতে লেপ দিবা॥

কবিরাজ—শ্রীরাসবিহারি রায়।
কবিকঙ্কণ।

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

—:*:—

চিকিৎসকের যাবতীয় জ্ঞাতব্যকে আমরা দুইটী বিষয়ে অবরোধ করিতে পারি। প্রথম রোগ-পরিচয়, দ্বিতীয় ঔষধ যোজনা বা চিকিৎসা। যে রোগপরিচয় চিকিৎসকের পক্ষে এত আবশ্যক, সেই রোগ পরিচয়ের জন্য মাধবের রোগবিনিশ্চয় অর্থাৎ নিদান ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ নাই। রোগবিনিশ্চয় করিবার জন্য যাহা জ্ঞাতব্য সমস্তই মাধব-নিদানে আছে,—আর কিছুই বক্তব্য নাই এই জন্যই কি মাধবনিদানের পর রোগবিনিশ্চয়ের জন্য আর কোন পুস্তক রচিত হয় নাই? একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়।

মাধবনিদানের টীকাকার বিজয়রক্ষিত স্বীকার করিয়াছেন যে, উপযুক্ত অথচ মাধবনিদানে অনুক্ত এমন অনেক বিষয় আছে। আর বলিয়াছেন,—আমি গ্রন্থব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই অনুক্ত বিষয়গুলি লিখিব। বিজয়রক্ষিত স্বরচিত টীকার গ্রন্থব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মাধবের কোন কোন অনুক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু মাধবনিদানের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রপূর্ত্তি রচনা করেন নাই। ইহা প্রতিসংস্কর্ত্তার কার্য্য, টীকাকারের কর্ত্তব্য নহে। বোধ হয় এই ভাবিয়াই বিজয়রক্ষিত প্রপূর্ত্তি লেখেন নাই। প্রতিসংস্কর্ত্তার কাজ কি ?

"বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যাতিবিস্তরম্।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্।"
দৃঢ়বলঃ।

প্রতিসংস্কর্ত্তা সংক্ষিপ্ত বিষয় বিস্তৃত করেন, বিস্তীর্ণ বিষয়কে সংক্ষেপ করেন—মোটের উপর বলিতে গেলে তিনি পুরাণ গ্রন্থকে প্রতিসংস্কৃত করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবনিদানের কি এইরূপ প্রতিসংস্কর্ত্তার প্রয়োজন নাই ? অধুনা সুলভ আকর গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের নিদানস্থানে যে সকল বিষয় আছে, মাধব কি সকল বিষয়েরই যথাযথ সংগ্রহ করিয়াছেন ? বাগ্‌ভট কেবল চরকাদির মতের পিষ্টপেষণ নহে, ইহাতেও অনেক অভিনব তত্ত্ব আছে—এ সকলও কি মাধবের নিদানে সুসংগৃহীত হইয়াছে ? যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদে কৃতশ্রম, তাঁহারা স্বয়ংই বলিবেন না যে, মাধবনিদানে এ সকল বিষয় সংগৃহীত হয় নাই। সাধারণের বুঝিবার জন্য আমরা কএকটী উদাহরণ দিতেছি—

মাধবনিদানের নিম্নলিখিত স্থলে সংক্ষেপের বিস্তার আবশ্যক।

(১) বাতাদি অতিসারের নিদানসংপ্রাপ্তি পৃথক্ নাই। চরক হইতে লইয়া বিস্তার করিতে হইবে। (২) নাসামুখাদিগত অর্শের (অধিমাংস) লক্ষণ মাধবে নাই, সুশ্রুত হইতে লইয়া লিখিতে হইবে। (৩) পাণ্ডুরোগের পূর্ব্বরূপ, সংপ্রাপ্তি, বাতাদি ভেদে নিদান, লক্ষণ মাধবে সংক্ষিপ্তভাবে আছে, চরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিস্তার করিতে হইবে। (৪) বেগরোধ, ক্ষয়, সাহস ও বিষমাশন এই চারিটী হেতুজন্য যক্ষ্মা রোগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ মাধবে নাই, আকর হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হইবে এবং যক্ষ্মার সংক্ষিপ্ত পূর্ব্বরূপকে বিস্তার করিতে হইবে। (৫) যক্ষ্মা ত্রিদোষজ ব্যাধি—ত্রিদোষের প্রত্যেকে কেমন করিয়া একাদশ লক্ষণ উৎপাদন করে, তাহার ব্যাখ্যা মাধবের নিদানে নাই, ইহা পূরণ করিতে হইবে। (৬) বাতাদি ভেদে প্রত্যেক কাসের নিদান মাধবে নাই, লিখিতে হইবে। (৭) ২০টী প্রমেহের মধ্যে কোন্ দশটী কফজ, কোন্ ছয়টী পিত্তজ এবং কোন্ ৪টী বাতজ তাহার নামোল্লেখ মাধবে নাই, আকর হইতে পূর্ণ করিতে হইবে। আর উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

মাধবনিদানের বিস্তারের সংক্ষিপ্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিসংস্কর্ত্তার সামান্যই কর্ত্তব্য আছে—কারণ মাধবে বিস্তর নাই, সংক্ষেপার্থই মাধবের উদ্যম। তবে শূকদোষের তুল্য যে সকল রোগের উল্লেখ আছে এবং যাহা অধুনা জনসমাজে প্রায় কাহারই হয়না, তাহাই বিস্তারের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তৎ পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

বিজয়রক্ষিত টীকারম্ভে—

উপযুক্তমিহানুক্তং নিদানং মাধবেন যৎ।
গ্রন্থব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেন ময়া তদপি লিখ্যতে।

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও মাধবের যাবতীয় উপযুক্ত অথচ অনুক্ত বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার টীকায় আমরা দেখিতে পাইনা। কএকটী উদাহরণ দিতেছি। (১) জ্বরের সৌম্যাগ্নের ভেদ এবং হারিদ্রক ও ঔপত্যকজ্বর মূল বা টীকা কোথাও নাই। (২) অতিসারের পূর্ব্বোৎপত্তি কথা অতিসার ও গ্রহণীর ভেদ এবং ঘটীযন্ত্রাখ্য গ্রহণী মূলে নাই, টীকাতে ও নাই। (৩) মদ্যগুণে কিপ্রকারে ওজোগুণের বিঘাত হইয়া মদাত্যয় রোগ জন্মে তাহা মূলে বা টীকায় কোথাও নাই। (৪) আবরণভেদে কুপিত বায়ুর লক্ষণ মূলে নাই, টীকাতেও নাই। ব্রণায়াম নামক বাতব্যাধি মূলে নাই, টীকাতেও নাই। (৫) শূলাধিকারে পার্শ্বশূল, কুক্ষিশূল, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, মূত্রশূল, বিট্‌শূল নাই, টীকাকারও উহাদের লক্ষণ উদ্ধৃত করেন নাই। (৬) অশ্মরীরোগে—বস্তির আকার, অবস্থিতি ও মূত্রসঞ্চয়-প্রকার সম্বন্ধে আকরে যাহা পাওয়া যায়, তাহা লেখা উচিত ছিল, কিন্তু মাধব বা বিজয় কেহই কিছু বলেন নাই। (৭) মসূরিকার শীতলাদি ভেদের উল্লেখ নাই। আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপযুক্ত অথচ অনুক্তের বিষয়ের ত উল্লেখই করিলাম না।

মাধবনিদান ও বিজয় রক্ষিতের ব্যাখ্যা-মধুকোষ লইয়া এই সকল কথা বলিবার আবশ্যকতা এই যে, আমি "প্রতিসংস্কৃত রোগ-বিনিশ্চয়" নামক একখানি পুস্তক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা "আয়ুর্ব্বেদ" মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়া দেশে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থে পূর্ব্বপ্রদর্শিত সমস্ত ত্রুটির সংশোধন জন্য কচিৎ পাদটীকা "প্রপূর্ত্তি" যোজিত হইয়াছে এবং বহু বিষয় মূলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপক্রমণিকাধ্যায়ে প্রকৃতিভূত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত বায়ুপিত্ত কফের কর্ম্ম, পঞ্চনিদান, ব্যাধিপরীক্ষা, প্রকৃতি, সাত্ম্য, বয়স এবং অঙ্গোপাঙ্গনিরূপণ নামক কএকটী অধ্যায় লিখিত হওয়ায় গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। মাধবে যাহা আছে ইহাতে তাহা ত আছেই, অধিকন্তু অনুক্ত অনেক সুভাষিত সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আশাকরি জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী এবং গুণগ্রাহি-অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপন দ্বারা চিকিৎসক সম্প্রদায়ের জ্ঞান বিবর্দ্ধনে সহায়তা করিবেন।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত
কাব্যতীর্থ কবিভূষণ।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার প্রথমতঃ কুষ্ঠের কথা বলিব।

প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে কুষ্ঠের ভেদক লক্ষণ প্রধানতঃ দুইটী ১। স্পর্শ শক্তি হীনতা ২। স্বেদাভাব (কচিৎ মাত্র দৃষ্ট হয়) স্পর্শজ্ঞানহীনতাই কুষ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভেদক লক্ষণ—Sir Malcom Morris K. C. V

O. F. R. C. S. &c. ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুষ্ঠাদি রোগ বিশেষজ্ঞ, তাঁহার উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। "Index of differenttial Diagnosis" গ্রন্থ হইতে তাহার উক্তির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

* * * After a time the macules and the neighbouring areas of apparently normal skin become more or less anœsthetic. As soon as anœsthesia arises the diagnosis is settled. This is indeed the crucial test in all cases of doubt as between leprosy and any other affections, for in leprosy it is almost invariably present, if not in the lesions themselves, then in the neighbouriug area of the skin.

অর্থাৎ—কিছু কাল পরে (কুষ্ঠের) মণ্ডলসমূহ এবং তৎসংলগ্ন স্থানের ত্বক্ (আক্রান্ত বলিয়া বোধ না হইলেও অল্প-বিস্তর পরিমাণে স্পর্শশক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। যে মুহূর্ত্তে স্পর্শশক্তিহীনতা প্রকাশ পায় তন্মুহূর্ত্তেই-রোগনির্ণয় স্থিরীকৃত হয়। কুষ্ঠ ও তৎসদৃশ অন্য রোগের সহিত সংশয় স্থলে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ণয়ের উপায় বা ভেদক লক্ষণ, কারণ কুষ্ঠরোগে ক্ষতে অথবা একান্তই ক্ষতে অনুভূত না হইলেও তৎসংলগ্ন স্থানে (ত্বকে), স্পর্শ শক্তিহীনতা প্রায় অব্যভিচারিতরূপেই বর্ত্তমান থাকে।

Sir Patrick Manson কৃত Tropical diseases নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কুষ্ঠরোগের নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "The touchstone in all doubtful cases is the presence or absence of anœsthesia. Anœsthesia is early absent in leprosy. In no other skin diseases is definite anaesthesia a eymptom"

অর্থাৎ—সমস্ত সন্দিগ্ধ স্থলেই স্পর্শশক্তির অস্তিত্ব বা অভাবই রোগ-নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। কুষ্ঠ রোগে স্পর্শশক্তি কদাচিৎ অক্ষুণ্ণ থাকে। কুষ্ঠ ভিন্ন আর কোন চর্ম্মরোগেই সুস্পষ্ট স্পর্শজ্ঞানাভাব লক্ষিত হয় না।* আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন, কায় চিকিৎসার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরকসংহিতায় ঠিক এই কথাটী এমন সুস্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধরূপে কথিত হইয়াছে যে, পড়িলে চমৎকৃত ও উৎফুল্ল হইতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ নির্ণয়ের প্রমাণ খুঁজিতে হয়। চরকসংহিতায় চিকিৎসিত স্থানের কুষ্ঠ চিকিৎসিতাধ্যায়ের সর্ব্ব প্রথম শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে

হেতুং দ্রব্যং লিঙ্গং কুষ্ঠানাম্ আশ্রয়প্রশমনঞ্চ
শৃণ্বগ্নিবেশ সম্যগ্ বিশেষতঃ স্পর্শনঘ্নানাম্

হে অগ্নিবেশ! বিশেষতঃ স্পর্শ জ্ঞান নাশক কুষ্ঠ রোগের কারণ, উপাদান, লক্ষণ, আশ্রয় ও প্রতীকার সম্যকরূপে শ্রবণ কর।

এমন অবিসম্বাদিতরূপে এমন লক্ষণ আর কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। সাধে কি "চরকস্তু চিকিৎসিতে" বলিয়া চরকের এত প্রশংসা!

* Tabetic ulcer (একজাতীয় বাতব্যাধির ক্ষত) রোগেও স্পর্শশক্তির অভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে চাক্ষুষ লক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা রোগ নির্ণীত হইয়া পড়ে, অতএব কুষ্ঠ সংশয় থাকিতে পারে না।

কোন কোন কুষ্ঠে বেদনা লক্ষণ আছে, যেমন কপাল ও ঔডুম্বর কুষ্ঠ "কপালং তোদ বহুলম্"। "রুগ্ দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতম্" ইত্যাদি সে স্থলে বেদনা প্রথমাবস্থার লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ" বিশেষতঃ স্পর্শ নয়ানাম্—এই বাক্য-বিরোধ পরিহার হয়না। Sir Malcom Morris ও তাহাই বলিয়াছেন। "They, *i. e.* the nodules in leprosy, are at first sometimes hyperœsthetic, but later very frequently become temporarily or permannently anæsthetic." অর্থাৎ কুষ্ঠরোগের মণ্ডলসমূহ সময়ে সময়ে প্রথমতঃ স্পর্শোদ্বিগ্ন অর্থাৎ বেদনাযুক্ত থাকে কিন্তু কিছুকাল পরে প্রায়ই স্থায়ী বা অস্থায়ী রূপে স্পর্শ শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ভেদক লক্ষণ স্বেদাভাব—*

Sir Malcom Morris এর উক্তিটুকু এই—"Another distinctive feature of leprous spots is, that they rarely perspire."

Sir Patrick Manson প্রভৃতিরও এই মত।

অর্থাৎ—কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানের আর একটী বিশিষ্ট লক্ষণ সেই স্থানে কচিৎ ঘর্ম্ম হয়। এই দ্বিতীয় লক্ষণটী প্রথমোক্ত লক্ষণের মত সুস্পষ্টরূপে কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই, বরং ইহার বিপরীত লক্ষণই স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় তথাপি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া এই লক্ষণটীও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের অনুমোদিত বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। কিরূপ বিচার-প্রণালীতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ—কুষ্ঠ রোগের পূর্ব্বরূপ সমূহের মধ্যে "স্বেদবাহুল্য মস্বেদনং বা" (সু-নি-কু-নি) "অতিস্বেদো ন বা" (চ-চি-কু-চি) এই দুইটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপের মধ্যে অতিস্বেদ পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রমতেও স্বীকৃত। এখন তর্ক "অস্বেদন" লইয়া। পূর্ব্বরূপ দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশিষ্ট, তন্মধ্যে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপই রূপাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাই ব্যক্তাবস্থার নামরূপ। অতিস্বেদও সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং স্বেদাভাব বিশিষ্ট পূর্ব্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে বোধহয় কোন দোষই হয় না, অথচ প্রত্যক্ষমূলক অন্য শাস্ত্রসম্বাদীও হইতে পারে। পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী লক্ষণকে সামান্য পূর্ব্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই, অথচ সেরূপ ব্যাখ্যায় স্থানভেদ ও কালভেদ অর্থাৎ কোন স্থানে অতিস্বেদ, কোনস্থানে স্বেদাভাব এবং কখনও অতিস্বেদ, কখনও স্বেদাভাব স্বীকার করিতে হয়, এরূপ ব্যাখ্যায় কল্পনাগৌরব দোষ ঘটে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলে এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত। অতিস্বেদন ও অস্বেদন—এই লক্ষণ দ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশও অনুধাবন যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরক সংহিতার কুষ্ঠ-চিকিৎসাধ্যায়ে কুষ্ঠ লক্ষণে কুত্রাপি স্বেদের কথা নাই, নিদান স্থানে

* দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে "স্ব (=কুষ্ঠ)-সংশয়ব্যাপ্যত্বে সতি স্পর্শহানিমত্বং কুষ্ঠত্বম্" কুষ্ঠের ইতর ব্যবর্ত্তক লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। 'স্ব-হেতুদ্রব্য-ঘটিতলিঙ্গব্যাপ্যতাবচ্ছিন্ন স্পর্শনয়ত্বং কুষ্ঠত্বম্,' কুষ্ঠের লক্ষণ এইভাবেও নির্দ্দেশ করা যায়।

সঞ্জাতক্রিমি কুষ্ঠের পিত্তকৃত উপদ্রবের মধ্যে স্বেদের কথা আছে, সুতরাং ঐ বিশিষ্ট ক্ষেত্র অতীত চরকের মতে কুষ্ঠলক্ষণে স্বেদাভাব অর্থাপত্তিতন্ত্রযুক্তি বলে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুশ্রুতে নিদান স্থানে মহাকুষ্ঠ সপ্তকের সামান্য লক্ষণের মধ্যেও স্বেদের কথা লিখিত নাই। সুতরাং চরক সুশ্রুত উভয় মতেই মহাকুষ্ঠের সামান্য লক্ষণ মধ্যে স্বেদ লক্ষণ নাই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—সুশ্রুতসংহিতার কুষ্ঠনিদানাধ্যায়ের "কুষ্ঠেষু রুক্‌ত্বক্‌সঙ্কোচস্বাপস্বেদভেদকৌণ্যস্বরোপঘাতা বাতেন" (অর্থাৎ বেদনা, ত্বক্ সঙ্কোচ, স্পর্শজ্ঞানাভাব, ঘর্ম্ম, বিদারণ, করভঙ্গ এবং স্বরভেদ এই গুলি কুষ্ঠের বাতকৃত লক্ষণ) এই বচনে স্বেদ লক্ষণ বিশেষ বিচার্য্য। এস্থলের ডল্লনকৃত টীকা পড়িলে মনে হয়, বিশেষ পাঠপ্রমাদ ঘটিয়াছে। টীকা উদ্ধৃত করিতেছি। সুধীগণদেখিবেন,—ডল্লনের কথা গুলি অতি গুরুতর।

"কুষ্ঠেষু রুগিতি। বাতকার্য্যেষু স্বেদশ্চিন্তা স্বাপভেদাবিত্যপি পঠন্তি। তত্রন অস্বেদপ্রতিষেধার্থঃ। ব্যাধিস্বভাবাৎ স্বেদঃ স্যাদিত্যপরে"। অর্থাৎ—কুষ্ঠে বেদনা ইত্যাদি বাতজনিত লক্ষণ সমূহের মধ্যে ঘর্ম্ম চিন্তা সুপ্তি বিদারণ এইরূপ পাঠ আছে। সেক্ষেত্রে স্বেদাভাবলক্ষণের নিষেধ ঘটিবে না। রোগ স্বভাব বশতঃ স্বেদ হইতে পারে—কেহ কেহ একথা বলেন। অধুনা প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় চিন্তা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত তিনটী লক্ষণেরই পাঠ দেখা যায়। ডল্লনের উপজীব্য গ্রন্থে কিরূপ পাঠ ছিল? আর যে পাঠই থাকুক, স্বেদ শব্দের পাঠ ছিল না,—কেননা ডল্লন স্বেদ লক্ষণের পাঠ লইয়াই বিশেষ বিচার করিয়াছেন। এস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য "তত্রন অস্বেদ প্রতিষেধার্থঃ" এই কথা। অস্বেদ লক্ষণ যদি অন্যতন্ত্রস্বীকৃত বা পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণ সম্মত মাত্র হইত, তাহা হইলে নিবন্ধসংগ্রহকার ডল্লনের পক্ষে তাহা উল্লেখ না করার কোন কারণ দেখা যাইত না। অপ্রামাণিক এবং পূর্ব্বাচার্য্য অনুক্ত লক্ষণ দ্বারা মূল গ্রন্থের পাঠান্তরের অর্থ সঙ্কোচ সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং ডল্লন ব্যাখ্যাত গ্রন্থে অস্বেদ লক্ষণের পাঠ নিশ্চয়ই ছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ডল্লনের রচনা-ভঙ্গীতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, অস্বেদ কুষ্ঠের অতি গুরুতর লক্ষণ। স্বেদের কথা স্বীকার করিলেও তদ্বারা অস্বেদ লক্ষণের নিষেধ ঘটিবে না। যদি অস্বেদ কুষ্ঠের নিয়ত লক্ষণ না হইত, বা বৈকল্পিক বা ব্যভিচারী লক্ষণ হইত, তাহা হইলে এই আশঙ্কা পরিহার নিরর্থক হইয়া পরে। সুশ্রুতে ত্বগাশ্রিত ও রক্তাশ্রিত কুষ্ঠ লক্ষণে স্বেদের কথা আছে। ডল্লন স্বেদ লক্ষণের কথা কিছুই বলেন নাই। বাগ্‌ভট কেবল রক্তাশ্রিত ও মাধবকর কেবল ত্বগাশ্রিত কুষ্ঠে স্বেদ পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু বিজয় রক্ষিত স্বেদ ও অস্বেদ উভয় লক্ষণ প্রতিপাদক স্বতন্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রতীচ্য মতেও ক্বচিৎ স্বেদ দৃষ্ট হয় স্বীকৃত হইয়াছে। অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। ত্বক্ সঙ্কোচ অঙ্গুলী পতন করভঙ্গ, কর্ণভঙ্গ, নাসাভঙ্গ, অক্ষিরাগ, স্বরভেদ এই লক্ষণ গুলি আয়ুর্ব্বেদ ও প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্র উভয় মতেই কুষ্ঠের বিশেষ লক্ষণ। আমাদের প্রতিপাদ্য ভেদনির্ণয়, সুতরাং রোগের সম্পূর্ণ আলোচনার অবকাশ ও অধিকার নাই, তথাপি

আর একটী কথা বলিয়াই কুষ্ঠরোগ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কুষ্ঠ সপ্তধাতুগত, রাজ যক্ষ্মাও সপ্তধাতুক্ষয়কর। উভয়ের এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া Sir Patrick Manson বলিয়াছেন,—রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও কুষ্ঠ ও যক্ষ্মার মত সর্ব্বদেহগত ব্যাধি এবং এইজন্য কুষ্ঠ রোগে সর্ব্বদেহ গত অবসাদ দৌর্ব্বল্য ক্ষয় * প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

কুষ্ঠ নির্ণয়ের পর বাতরক্তনির্ণয় আমাদের প্রতিপাদ্য। বাতরক্তের নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রমের একটী উদাহরণ দিব। প্রচলিত মুদ্রিত যে কয় খানি মাধব নিদানে আয়ুর্ব্বেদীয় নামের অনুরূপ ডাক্তারী নাম নিবেশিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই কুষ্ঠ ও বাত রক্তের ডাক্তারী নাম Leprosy লিখিত হইয়াছে। এমন কি, স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহোদয়ও তাঁহার মাধব নিদানের অনুবাদে এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। আমার ধারণা হইয়াছে, হস্তমূল গত বাতরক্ত ও পাদমূল গত বাতরক্তের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে (যথাক্রমে) Erythema Nodosum ও Erythema Induratum Scrofulosorum এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রতীচ্য চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে এই দ্বিবিধ রোগের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদন করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং আমাদের তাহা উদ্দেশ্যও নহে।

সর্ব্বদোষ সম্বন্ধ থাকিলেও প্রধানতঃ বাতরক্তে বায়ু দুষ্টিরই প্রাধান্য। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—"তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্" তৎ প্রাবল্যাৎ তস্য বাতস্য দোষস্বেন প্রাধান্যাৎ (বাতরক্তাধিকার) অর্থাৎ বায়ুর প্রাধান্য বশতই বাতরক্ত নাম হইয়াছে। যন্ত্রণা এবং স্পর্শশক্তিহীনতা—উভয়ই বায়ুবিকার। এক্ষণে বিচার্য্য এই বাত রক্তে কিরূপ বিকার উৎপন্ন হয়? তদুত্তরে আমরা বলিব বেদনা এবং এই বেদনাই বাতরক্তের প্রথম ও প্রধান ভেদক লক্ষণ *

স্থিতং পিত্তাদি সংসৃষ্টং তাস্তাঃ সৃজতি বেদনাঃ।
কণ্ডূদাহ রুগায়ামতোদ স্ফুরণ কুঞ্চনৈঃ।
অন্বিতা শ্যাবরক্তাত্বক্................ ॥
গম্ভীরে শ্বয়থুঃ স্তব্ধঃ কঠিনোঽথ ভৃশার্ত্তিমান্।
রুগ্বিদাহান্বিতোঽত্যু তীক্ষ্ণং বায়ুঃ সন্ধ্যস্থিমজ্জসু।
ছিন্দন্নিব চরত্যন্তং বক্রীকুর্ব্বংশ্চ বেগবান্॥

* কুষ্ঠ রোগও মারাত্মক অথবা রাজযক্ষ্মাক্রান্ত হইতে পারে। "It may even prove fatal as a sort of galloping leprosy within a year. ** one must be careful to exclude the possibility of contamination with Bacilus Tuberculosis with which the lepers are often infected". * * অর্থাৎ এই জাতীয় কুষ্ঠ আশুকারী কুষ্ঠরূপে একবৎসরের মধ্যেই জীবনান্ত করিতে পারে। * * কুষ্ঠরোগী অনেক সময় যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়, অতএব কুষ্ঠবীজাণু পরীক্ষাকালে যক্ষ্মাবীজাণু মিশ্রিত না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।
• Tropical diseases.

* দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে "স্ব (বাতরক্ত) সংশয়ব্যাপ্যত্বাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্টবেদনাবত্বং বাতরক্তত্বম্" বাতরক্তের ইতর ব্যবর্ত্তক লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। "কুপিত বাতশোণিতজন্যবিশিষ্ট সংপ্রাপ্ত্যবচ্ছিন্ন সকৃদাবির্ভাবোপরমপূর্ব্বরূপব্যাপ্যবিশিষ্টবেদনাবচ্ছিন্ন লিঙ্গত্বং বাতরক্তত্বম্" বাতরক্তের লক্ষণ এইরূপ ও বলা যায়।

রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখা সন্ধিষু মারুতঃ
নিবেশ্যান্যোন্যমাবাধ্য বেদনাভির্হরেদসূন্।
(চরক বা শোঃ চিঃ অঃ)

অর্থাৎ (বাতরক্ত) পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত সেই সমস্ত (পিত্তাদিকৃত) বেদনা উৎপাদন করে। উত্তাপ বাতরক্তে ত্বক্ চুলকানি, দাহন বেদনা, প্রসারণ, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, স্পন্দন ও কুঞ্চন যুক্ত এবং শুক্লকৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ হয়। গম্ভীর বাতরক্তে শোথ স্তব্ধ, কঠিন ও অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয়। বেদনা ও বিদাহ যুক্ত বায়ু সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাতে প্রকাশিত হইয়া ছেদনবৎ পীড়া উৎপন্ন করে এবং (হস্ত পদাদি) বক্র করিয়া ফেলে। হস্ত পদাদির সন্ধি স্থানে বায়ু প্রবেশ করিয়া রক্তের পথ রুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে দূষিত করিয়া বেদনায় প্রাণান্ত করে।

বাতরক্তের সংপ্রাপ্তি এবং সামান্য লক্ষণ সমূহের মধ্যে চরক কুত্রাপি সুপ্তি বা স্পর্শ শক্তি হীনতার কথা বলেন নাই। সুশ্রুতের নিদান স্থানে—"স্পর্শোদ্বিগ্নৌ তোদভেদ প্রশোষস্বাপো পেতৌ বাতরক্তেন পাদৌ"—এই বচনে বাতকৃত লক্ষণের মধ্যে স্পর্শোদ্বিগ্নত্ব অর্থাৎ স্পর্শাসহত্ব এবং সুপ্তি এই দুইটী লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। চরকে বাতকৃত লক্ষণে সুপ্তির প্রসঙ্গও পাই বরং—

"বিশেষতঃ শিরায়াম তোদ স্ফুরণ ভেদনম্ ..অঙ্গগ্রহোঽতিরুক্" এই বচনে বিশেষরূপে তোদ অর্থাৎ সূচী বেধবৎ যন্ত্রণা ও অতিরুক্ (বাতশোণিত চিকিৎসিতাধ্যায়) লক্ষণই পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট গোলযোগ দেখিয়া উভয়েরই মর্য্যাদা রাখিয়াছেন। তিনি বাতাধিক্যের লক্ষণ বলিতে যাইয়া "...অধিকং তত্রশূলং...অতিরুক্" এই দুই লক্ষণের সঙ্গে ২ "স্তম্ভ বেপথু সুপ্তয়ঃ..." বলিয়া সুপ্তির কথাও বলিয়াছেন। চরক সংহিতায় কেবল শ্লেষ্ম লক্ষণের মধ্যে সুপ্তির কথা আছে। মাধবকর বাগ্‌ভটেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন।

প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:০:—

স্বাস্থ্য ও শক্তি।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, বীণাপাণি বুকক্লাব, ২১ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। শারীর চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কিরূপ ভাবে দিন চর্য্যা করা কর্ত্তব্য—এ পুস্তকে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যায়ামের দ্বারা মানুষ কতটা উন্নত হইতে পারে—গ্রন্থকার তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া অনেক গুলি ব্যায়ামশীলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ব্যায়ামের প্রথমে গ্রন্থকার সে কালের 'প্রাণায়ামে'র

কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন। 'প্রাণায়ামে'র 'পূরক' 'কুম্ভক' ও 'রেচক' প্রক্রিয়ায় ব্যায়ামের উদ্দেশ্য কিরূপ সিদ্ধ হয়, তাহা গত মাসে "অনুকরণে আমাদের অবস্থা" প্রবন্ধের লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সাবেক 'কপাটী' 'হাডুগুডু' খেলাই যে আমাদের দেশের বালকগণের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম,—গ্রন্থ মধ্যে এ পরিচয় পাইয়াও আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট,—বিষয় গুলি তদপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এরূপ গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকায় ন্যায় প্রত্যেক গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ গ্রন্থ খানিকে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের জন্য মনোনীত করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে।

চণ্ডী-চরিতামৃত।—শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণয়ালিসষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত। মূল্য।/০ আনা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্য অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এ ধরণের গ্রন্থের অনুবাদ করা অতিশয় কঠিন। কিন্তু গ্রন্থকারের কবিত্ব নৈপুণ্যে তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পদ্য গুলি বেশ সরল, সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিবেন। নানারূপ ছন্দো-বিন্যাসে গ্রন্থখানি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমাদের দেশের রমণী মণ্ডলী এই পদ্য অনুবাদ আবৃত্তি করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠের পুণ্যলাভ করিতে পারেন।

পরিচারিকা।—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা রাণী নিরুপমা দেবী। শ্রীজানকী বল্লভ বিশ্বাস কার্য্যাধ্যক্ষ, কার্য্যালয়—কোচবিহার। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৸০ আনা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। প্রথমেই সম্পাদিকার ওঁ (কবিতা)। ভাষার ঝঙ্কারে এবং ভাবের মাধুর্য্যে বড়ই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে, লেখিকার কবিত্ব যেন কবিতার প্রত্যেক কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "জীবরাজ্যে মানুষের যথার্থ স্থান" মানুষের সহিত অপরাপর ইতর জীবের যে একটি রক্তের সম্পর্ক আছে—কয়েকটি যুক্তি দ্বারা তাহা বেশ বুঝান হইয়াছে। "শ্যামা" কবিতাটি খুব ঝঙ্কার পূর্ণ, তবে 'ঢুলাও আঁখি তব নিবিড় চুমে' চুমের এই নিবিড়ত্ব পাঠকের ভাল লাগিলেই ভাল। 'মঙ্গল ঘট' ক্রমশঃ গল্প। নিঃস্বের অধিকার' একটি চলন সই কবিতা। 'বাঙ্গলার ছন্দ ও তাল' প্রবন্ধটি গবেষণা পূর্ণ। 'কল্পনা' কবিতাটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অস্পৃশ্য' গল্পটি মনোরম। 'গৃহের প্রতি' কবিতাটি মন্দ হয় নাই। "পাঠান দিল্লীর প্রতিবাদে" অনেক গুলি নূতন কথা অবগত হওয়া যায়। 'বিস্মৃত দেশে' একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। 'ঐশ্বর্য্য', একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। 'প্রণয় আমার' আদর্শেরই অনুরূপ হইয়াছে। 'দিল্লীর ভীমপাদ তীর্থের আবিষ্কর্ত্তা' প্রবন্ধে শিখিবার বিষয় আছে। 'পরিচারিকা'র সম্পাদন কার্য্য খুব ভালরূপই হইতেছে, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিরই 'পরিচারিকা' পাঠ করা উচিত।

নারায়ণ।—মাসিক পত্র। তৃতীয় বর্ষ ২য়খণ্ড—১ম সংখ্যা,—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ। কার্য্যালয় ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৩৷০ টাকা। এবারের প্রথমেই কবিতা "পয় আহারী বাবা"। ঠাকুর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

মহাপ্রভুর কৃপা ভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত শ্রীশ্রীমৎগুরু মঙ্গল পুস্তকে কথিত একটী সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কবিতাটি বেশ হইয়াছে। ২য় প্রবন্ধ "বাঙ্গালার কথা।" অপূর্ব্ব—উপাদেয়—অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ভাবিবার—জানিবার—বুঝিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। এ প্রবন্ধের তুলনা নাই, সকলেরই যত্ন পূর্ব্বক এটি পাঠ করা উচিত। ইহার পর "তিনুর মা"—একটি গল্প। এ গল্পে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-মিলন নাই, চাঁদের কিরণ—মলয় মারুত—হা-হুতাশ—লইয়াও এ গল্প রচিত হয় নাই, সেজন্য ইহা নব্য-পাঠকের ভাল লাগিবে কিনা জানিনা, কিন্তু এ গল্পে দরিদ্রা—নীচ জাতীয়া—চণ্ডাল বিধবার স্বার্থবলির দৃষ্টান্তে পল্লীচিত্রের একটী বিশেষ অঙ্ক অতি অল্পের ভিতর বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—গল্প লিখিতে হইলে এইরূপই ত লেখা উচিত। অনেক পল্লীগ্রামেই এই গল্পের অন্যতর নায়ক 'রায় মহাশয়ের' চিত্র খুঁজিলে বাহির হইতে পারে। "সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য" প্রবন্ধে সেরূপ বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। "বিরহে পাগল" প্রবন্ধে "বিক্রমোর্ব্বশী"র বেশ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

কাজের লোক।—মাসিক পত্র। ১১শ বর্ষ, ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—, কার্য্যালয় ৭নং অক্রুর দত্তের লেন। বার্ষিক মূল্য ২৷৷০। কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য—অনেক বিষয়েরই আলোচনা ইহাতে হইয়া থাকে দেখা গেল। ইহার অধিকাংশ লেখাই কাজের কথার পূর্ণ। সহযোগী গার্হস্থ্য শিল্প লইয়া যে সকল আলোচনা করেন, তাহা হইতে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। হোমিওপ্যাথিক তথ্য এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পড়িলে অনেক সময় উপকার হইতে পারে। "কৃষি তথ্যে"ও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। গল্প ও কবিতাগুলি মুখরোচক হইলেও কিন্তু সহযোগীর উদ্দেশ্যের সহায়তা করিতেছে বলিয়া মনে হইলনা, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন কালে এ ধরণের লেখা একটু বাছিয়া-গুছিয়া মানানীত করিলে ভাল হয়।

স্বাস্থ্য সমাচার।—মাসিক পত্র। ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ। সম্পাদক ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম, বি। কার্য্যালয় ৩৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। 'আলোচনা' প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। 'মানব দেহে শিল্প সৌন্দর্য্য' সুন্দর প্রবন্ধ। 'রঙের কথা'য় লেখক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, "কোন লোকবে লাল ঘরে পুরিয়া ২।১ দিন রাখিলে সে পাগল হইয়া যাইবে"—এ বিষয় কিন্তু পরীক্ষা না করিলে গ্রহণ করা যায় না। ঘরের মধ্যেই যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে লাল বর্ণের পোষাকেও ত কতকটা ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু কাহাকেও সেরূপ হইতে ত শুনিতে পাই নাই, তবে লালবর্ণের চেলি পরিধানের ফলে বিবাহের পর অনেক বর-কণে প্রেমে পাগল হইয়াছে—দেখা গিয়াছে! "চন্দন" প্রবন্ধ পাঠে পাঠকের উপকার হইবে। "অহিফেন ব্যবহার" উদ্ধৃত প্রবন্ধ, ইহার সমস্ত কথায় আমরা একমত হইতে পারিলামনা। "ধাতুপাত্র" বিশেষ গবেষণা পূর্ণ।

শ্রাবণ মাসের সূচী।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও
১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

ভাদ্র, ১৩২৪ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্" Reg. C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

" শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,

সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵৹

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৹

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
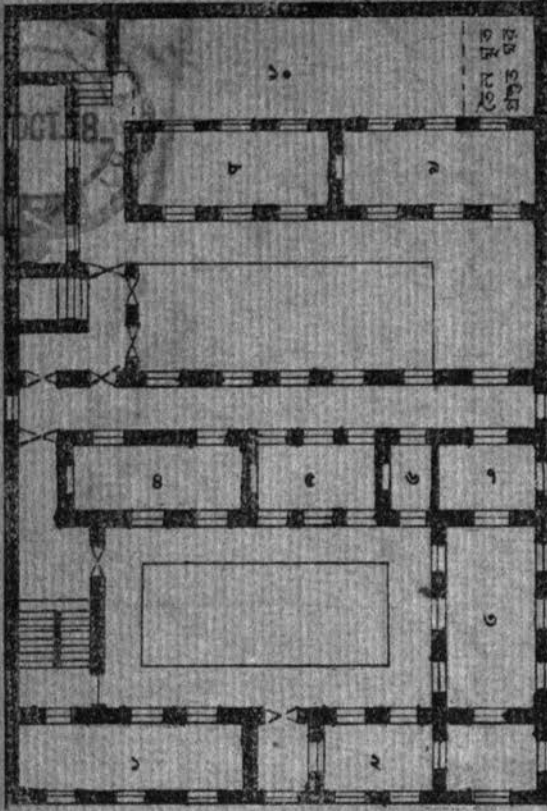
এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।
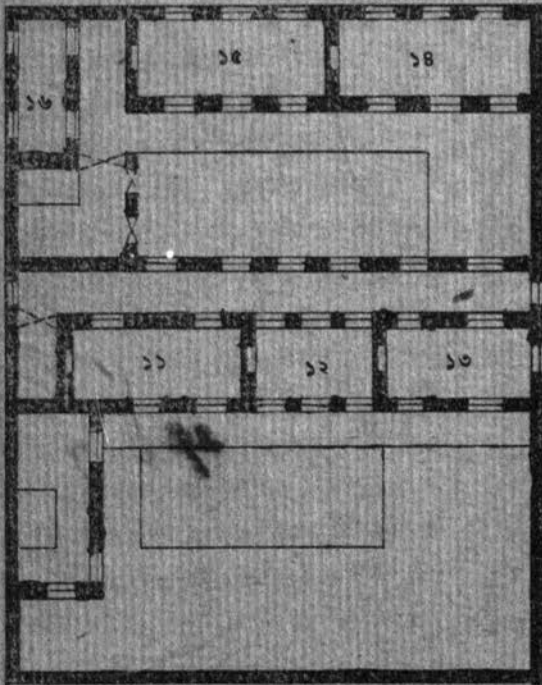
দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।
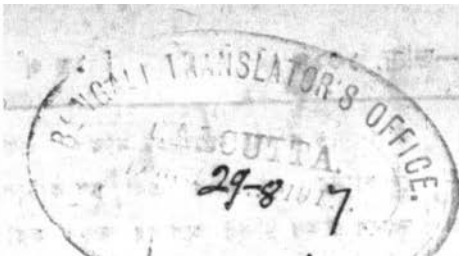
আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—ভাদ্র। | ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—*—

স্বাস্থ্য ও সদাচার।—স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সদাচারের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ আমাদিগকে সদ্বৃত্ত পরায়ণ হইবার জন্য তাঁহাদিগের রচিত নানাবিধ শাস্ত্রে যে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, স্বাস্থ্য রক্ষাই তাহার মূল কারণ। পাপ এবং পুণ্য কেহ মানুন বা না মানুন, পাপ এবং পুণ্যের ফলে স্বর্গ ও নরক-ভোগের চিত্র কল্পনা-প্রসূত বা অতিরঞ্জিত বলিয়া যাঁহারা মনে করিতে হয় করুন, তাহাতে কাহারও আসিয়া-যাইতেছে না; কিন্তু সদাচার-ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে নানারূপ ব্যাধি-বিজড়িত-দেহে অনেকে পার্থিব-জীবন বহনই বিড়ম্বনাময় এবং শেষে অকাল-মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছেন,—ইহা ত চক্ষের সম্মুখে প্রতি-নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার ইহাকেই পাপ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহারই ফল রোগ। ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দু যে দিন হইতে এই তত্ত্ব ভুলিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহার সংসার নানারূপ ব্যাধির আকর ভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

অভক্ষ্য ভক্ষণ।—অভক্ষ্য-ভোক্ষণ বলিলে শুধু যে হিন্দু জাতির নিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি আহারই বুঝাইয়া থাকে,—এমন নহে। হিন্দুর অশুচি সমম্বিত আহার্য্য মাত্রেই হিন্দুর নিকট অভক্ষ্য পদবাচ্য। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, ছাগমাংস তাহার মধ্যে অন্যতর, কিন্তু এই ছাগ মাংস খাইবার পূর্ব্বে দেবতার উদ্দেশ বলি-প্রদানের ব্যবস্থা না করিয়া, উহা ভক্ষণ করা যে অপকর্ম্ম—ইহাও শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। এখনকার কালে কিন্তু সকল স্থলে সে শাস্ত্র-বাক্য প্রতিপালিত হয় না। সহরে কসাই-দিগের দোকান গুলিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছাগীর মাংস ভক্ষণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে, এজন্য উহা ভক্ষণ করা আমাদের শাস্ত্র নিষিদ্ধ। বৃদ্ধ, জরা এবং রোগ পীড়িত

ছাগ মাংসও আমাদের ভক্ষণের বিধিবহির্ভূত। দোকানে কিন্তু ছাগী ও ছাগ—জরা ও রুগ্ন—সকল প্রকার মাংসই বিক্রয় করা হইয়া থাকে। 'বাবু'রা তাহাই সাগ্রহে ক্রয় পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন! এই সকল মাংস-ভক্ষণে কিন্তু অনেক সময় অপকারই হইয়া থাকে। অজীর্ণ এবং যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা দেশে যে সকল কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও তাহার একটি কারণ। সকলেরই এ সকল কথা চিন্তা করা উচিত।

* * *

দোকানের রাঁধা মাংস।—দোকানের রাঁধা মাংস, চপ-কাট্‌লেটের প্রচলনও এখন সকল গৃহেই যথেষ্ট বাড়িয়াছে। কসাইয়ের দোকান হইতে ঐ সকল মাংস যে আমদানি করা হয়, তাহা বোধ হয়—না বলিলেও চলিবে। একে মাংসের অবস্থা ঐরূপ, তাহার উপর অপকৃষ্ট ঘৃত-মসলা-সংযোগে ঐ সকল মাংস রন্ধন করা হয়। ধর্ম্ম হানির কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু স্বাস্থ্য হানি ত ইহার ফলে অবশ্যম্ভাবী। তাহার পর চেয়ারে বসিয়া, টেবিলে রাখিয়া, যে সকল 'ডিসে' ঐ সকল খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহার ফলেও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য হানির কারণ যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। পিতল এবং কাঁসার পাত্র মাজিয়া-ঘসিয়া লইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে কিন্তু কাচ এবং এনামেলের পাত্র যেরূপ ভাবে মাজিয়া-ঘসিয়া লওয়া হউকনা কেন, উহা শুদ্ধ হইতেই পারেনা। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা মাটির গ্ল্যাসের কথা উল্লেখ করিতে পারি। তা' ছাড়া, চায়ের দোকানের মত এখানেও 'ডিস' এবং জল পাত্র বা গ্লাসগুলি কখন মৃত্তিকা-সংযোগে পরিষ্কার করা হয়না, শুধু জলে ধৌত করিয়া লওয়া হয় মাত্র। এজন্য দোকানের এই মাংস এবং চপ্-কাটলেট ভক্ষণে একের উচ্ছিষ্ট অপরের ভক্ষণ করার ফলে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, ইহা নির্ভেজ সত্য কথা। দেশে সংক্রামক রোগ-বাহুল্যের ইহাও কারণ।

* * *

মুখপ্রক্ষালনে বিরক্তি ভাব।—ভোজনান্তে যে মুখ-প্রক্ষালনের রীতি প্রচলিত আছে; এখনকার দিনে অনেকে তাহাও মানিয়া চলেননা। রাঁধা মাংস বা চপ্-কাটলেটের দোকানে যাঁহারা রসনার তৃপ্তি লাভ করিয়া পবিত্র (!) হইয়া থাকেন, তাঁহারা ত এ রীতি মানিতেই পারেননা,—দোকানে ত আর তাঁহাদিগের জন্য সেরূপ ভাবে জল-সরবরাহের আবশ্যকতা দোকানদার মনে করিতে পারেনা,—'বাবু ভায়াদের'ও তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, কাজেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচ্ছিষ্ট গ্ল্যাসের জলে হস্ত ডুবাইয়া এবং ঐ হস্ত একবার মুখমণ্ডলে বুলাইয়া—রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেই মুখ-প্রক্ষালনের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গেল,—ইহাই হইল—দোকানে বসিয়া আহারান্তে মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা! ইহা ভিন্ন ভোজ-নিমন্ত্রণেও অনেককে ঐরূপ ভাবে মুখ-প্রক্ষালনের বিরত দেখিতে পাই। ফলে ভোজনকালীন চর্ব্বিত দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে মুখ-প্রক্ষালনের অভাবে দন্ত-সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অনেককেই অসময়ে দাঁত বাঁধাইবার দায়ে পড়িতে হয়। আজকাল যে এত যে dentist বা দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, মুখ প্রক্ষালনে বিরক্তি পূর্ণ 'বাবু ভায়ারা'ই সেই সকল চিকিৎসকের ব্যবসায়-বৃদ্ধির কারণ। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর

বয়সে যৌবনের বল বীর্য্য অটুট না থাকুক, একেবারে নষ্ট হইবার ত কথা নহে, কিন্তু দন্ত-চিকিৎসকদিগের দোকানে গিয়া অনুসন্ধান করুন, তাঁহাদিগের খরিদদারদিগের মধ্যে ঐ বয়সের লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ফল কথা, আমাদিগের রুচি-বিপর্য্যয়ে অনেক প্রকারেই আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটিতেছে।

* * *

তাম্বূলে মুখ শুদ্ধি।—তাম্বূলে মুখ শুদ্ধির ব্যবস্থা বরাবরই প্রচলিত আছে। ইহার গুণ-ব্যাখ্যায় আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—"ইহা বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, সর, বশ্য, তিক্ত, কটুক্ষার, রক্তপিত্ত জনক, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্ম নাশক, মুখের দুর্গন্ধ নিবারক, মলাপহারক, বায়ু নিবারক ও শ্রম শান্তি কর।" কিন্তু মুখ শুদ্ধি করা ভিন্ন অনেকে যখন-তখন যে ইহার অত্যধিক ব্যবহার করেন, তাহার ফলে দন্তরোগ উপস্থিত হয়। অকালে দাঁত বাঁধাইবার কারণও এই অতিরিক্ত তাম্বূল বা পান চর্ব্বনের ফলে ঘটিয়া থাকে। তা' ছাড়া, ইহা রক্তপিত্তজনক বলিয়া ইহার অধিক ব্যবহারে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার আশঙ্কা করা যায়। ইহা তীক্ষ্ণ এবং কটুক্ষার বলিয়া ইহার অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কলিকাতায় আজ-কাল পানের খিলির দোকানও অলিতে-গলিতে, অজীর্ণ রোগে ও অনেক পল্লী জর্জ্জরীত প্রায়। ফল কথা, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে, বিষও অমৃতের ন্যায় উপকারী হইয়া থাকে এবং ব্যবহার-বাহুল্যে অমৃতও জীর্ণ করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া থাকে,—ইহা চির প্রচলিত সত্য কথা। ইহা ভিন্ন পানে যে গুপারি ব্যবহার করা হয়, তাহারও অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তাম্বূলের অতিরিক্ত ভক্ত ব্যক্তিগণ এসকল চিন্তা করেন,—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশ ছারখার হইতে বসিয়াছে। প্রতিবৎসরই এই সময় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ইহার তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম গুলি কিরূপ ভীতি-বিহবল চিত্তে ত্রাস্তভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রথমতঃ যশোহর জেলার গদখালি গ্রামে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, তাহার পর ঐ জেলারই শ্রীনগর গ্রামটী ধ্বংস করিয়া, নদীয়ার উলা বা বীরনগর গ্রামে ইহার প্রকট লীলা পরিলক্ষিত হয়, সে লীলা বড় সহজ হয় নাই, নদীয়া জেলার শান্তিপুরের পর উলা বা বীরনগরের মত পল্লী আর একটিও ছিল না, সেই সুবৃহৎ পল্লীর প্রায় তাবৎ অধিবাসীই এই দুরন্ত রাক্ষসীর করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় আজি সেই সুবৃহৎ পল্লীখানি কয়েকটি মুষ্টিমেয় অধিবাসী লইয়া পূর্ব্ব স্মৃতি রক্ষা করিতেছে দেখিতে পাই। সুবৃহৎ সৌধ-গুলির পতিত ইষ্টকস্তূপ বনাকীর্ণ-পল্লীর মধ্যে অট্টহাস্য করিয়া এক্ষণে সেই একদা-জনবহুল-পল্লী-স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে মাত্র।

তাহার পর উলা বা বীরনগর ধ্বংস

করিয়া, ম্যালেরিয়া সমগ্র নদীয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—অনেকগুলি গ্রাম ইহার করাল-গ্রাসে উৎসন্ন-প্রায় হইল। তাহার পর, মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া, রাজসাহি, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সকল জেলাই অধিকার পূর্ব্বক ইহার স্বভাব সিদ্ধ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এদিকে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশপরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর বীরভূম প্রভৃতিও ইহার প্রভাবে অক্ষুণ্ণ রহিল না,—এক কথায় একে একে সমগ্র বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি হইয়া পড়িল। উলা এবং বীরনগরের পর রংপুর, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির অবস্থা ইহার আক্রমণে যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, এরূপ আর বাঙ্গালার কোন জেলা হয় নাই। এখন কিন্তু সে কয়েকটি জেলা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হুগলি, বর্দ্ধমান এবং ২৪ পরগণা প্রভৃতির অবস্থাই অধিক শোচনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানগুলির উপর ইহার অনুগ্রহটা যেন অধিক বলিয়া মনে হয়। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী নদীয়ার শান্তিপুর এবং গঙ্গার শাখা চূর্ণী, নদীর তীরবর্ত্তী রাণাঘাটের কথা আমরা ভালরূপই বলিতে পারি,—গত কয়েক বৎসরে শান্তিপুর এবং রাণাঘাটের মত ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ এতদ্দেশীয় অনেক পল্লীই সহ্য করিয়াছে কি না সন্দেহ।

বঙ্গে ম্যালেরিয়া ছিল না, কি করিয়া যে ইহার আবির্ভাব হইল, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ফলে দেশের জল বায়ু দূষিত হওয়াই ইহার আবির্ভাবের যে কারণ, সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার পল্লীগুলির অধিকাংশ স্থানই এখন পঙ্কিল-খাল-ডোবায় পূর্ণ হইয়াছে। সে কালের মত ধনীর অর্থ এখন আর পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা-প্রতিষ্ঠা বা নষ্টপ্রায়-জলাশয় গুলির সংস্কার-কার্য্যে ব্যয়িত হয়না। ফলে দূষিত জল ব্যবহারই যে অনেক পল্লীর ম্যালেরিয়া ভোগের কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। আমরা এমন অনেক পল্লীর কথা অবগত আছি, যে সকল পল্লীতে আদৌ কোনরূপ জলাশয় নাই, বৃষ্টির ধারাপূর্ণ ডোবা বা গর্ত্তের জলেই বর্ষা কালে সেই সকল পল্লীর অধিবাসী-গণের স্নান-পানাদি সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, অন্য সময় অর্দ্ধ ক্রোশ—কোন কোন স্থলে তাহারও অধিক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সেই সকল পল্লীর আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এই জলকষ্ট বাঙ্গালার শুধু ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতির কারণ নহে, দেশে ওলাউঠা-উদারাময় প্রভৃতি রোগ-বৃদ্ধিও এই জল কষ্টের হেতুভূত। মালদহ জেলায় প্রতি বৎসর ওলা-উঠায় অনেক লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে, সে জেলার জলকষ্টই ইহার কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি।

শুধু জল কষ্ট নহে, বাঙ্গালার পল্লী গুলি এখন বন-বহুলও হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই বন-বিটপী সকল হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকৃষ্ট বীজ মশকের উৎপত্তির আধিক্য হইয়া থাকে। সেকালে পল্লীবাসীর কেহ পাথুরিয়া কয়লার জ্বালে রন্ধন কার্য্য করিতনা, পাথুরিয়া কয়লার আমদানি ও তখন হয় নাই—বন-বিটপী সকলই তখনকার দিনে পল্লীবাসীর ইন্ধনের কার্য্য সিদ্ধ করিত। কাজেই হেলায়-শ্রদ্ধায় তখন পল্লীগ্রামের জঙ্গল গুলি নষ্ট হইয়া পড়িত। এ ছাড়া—সে কালের পল্লী-মাতার সুসন্তানগণ পিতৃপুরুষের কর্ম্মণ্য সকল বজায় রাখিবার জন্য সুমতি পরায়ণ ছিলেন, তাহার ফলে

বাঙ্গালার পল্লী গুলিতে বার মাসে তের পার্ব্বন হইত, বিশেষতঃ শারদীয় পূজার সময়ে পল্লী মাতার সজ্জা-সম্ভার দেখিয়া দিগ্বধূগণ হাসিয়া উঠিত। সে সজ্জা-সম্ভার বলিতে শুধু সৌধ-প্রাসাদের শোভা-বৃদ্ধি বুঝাইতনা,—অভিনব পরিচ্ছদে পরিবার-পরিজনের সম্পদ-বর্দ্ধনের অনুষ্ঠান বুঝাইত না,—সে সকল ব্যবস্থা যে, সেকালে ছিল না—এমন নহে, সে সকল ব্যবস্থা ত ছিলই, কিন্তু তাহা ভিন্ন পূজা অন্তে—প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষে—প্রতিমা লইয়া যে পল্লী-পরিভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল,—তাহারই জন্য পল্লীর বন-জঙ্গল গুলি বাধ্য হইয়া পরিষ্কার করান হইত—প্রতিমা লইয়া পরিভ্রমণ কালে বন-জঙ্গল থাকিলে প্রতিমা ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এই আশঙ্কা করিয়াই পল্লী-পথগুলির বন কাটানর ব্যবস্থা করা হইত। ফলে যে কারণেই হউক, এ কালের মত সে কালে বাঙ্গালার পল্লীগুলি বন-বহুল ছিল না। এই সকল ব্যবস্থা যে সময় হইতে দেশে লুপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে।

পয়ঃপ্রণালীর অভাব বাঙ্গালার পল্লী ধ্বংসের আর একটি কারণ। পল্লী-ভূমির যে সকল বড় বড় স্থানে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সে সকল স্থানের অধিকাংশ স্থলে জল-নিকাশের ব্যবস্থা নাই, কাজেই সে সকল স্থানে শুষ্ক বৃক্ষপত্র প্রভৃতি পচিয়া তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় ঘটাইতেছে। যে সকল পল্লী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্নিহিত নহে, সে সকল পল্লীতে ত পয়ঃ প্রণালীর কোনরূপ ব্যবস্থাই নাই। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, কিন্তু বিশুদ্ধ জল-সংস্থান এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কারের মত এটিরও ব্যবস্থা না করিলে চলিবেনা।

গঙ্গার তীরবর্ত্তী পল্লীগুলির উপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াছি, তাহার প্রধান কারণ—বাঙ্গালায় রেল-বিস্তার। এই রেল-বিস্তারের ফলে যে সকল স্থলে গঙ্গা বা তাহার শাখা নদীগুলির উপর রেলকোম্পানী সেতু-বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই ইহার প্রভাবাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা হাওড়া, হুগলি এবং সারা ঘাট অঞ্চলের কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই রেল-বিস্তৃতির ফলে নদী সকল যে স্বল্পতোয়া হইয়া পড়িতেছে,—নদীজলে 'পলি' পড়িয়া জলের অবিশুদ্ধ স্রোতঃ সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, তাহারই ফলে ম্যালেরিয়া-বিষের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়া, নদী পার্শ্বস্থ পল্লীগুলি ম্যালেরিয়া-প্রবণ হইতেছে। ইহার প্রতীকারের উপায় আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত। পতিত 'পলি'গুলি তুলিয়া ফেলিয়া, স্বল্পতোয়া নদীগুলির স্রোতঃ-বাহুল্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে, বঙ্গীয় সেনেটারি বিভাগকে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাঁহাদিগের সকরুণ দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার প্রতীকারের উপায় নাই।

আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর অবশ্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তায় উদাসীন নহেন। মিউনিসিপ্যালিটি,জেলাবোর্ড,লোকাল-বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর রাশি রাশি অর্থও এজন্য ব্যয়িত করার ব্যবস্থা আছে। সংপ্রতি গত ১৯১৬ সালের ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্য-বিবরণী যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা দেশে মোট ১১১টি মিউনিসিপ্যালিটির ৮৮, ৩৭, ৩০২

টাকা আয়ের শত করা ৩৭, ১৮ ভাগ স্বাস্থ্যোন্নতি কার্য্যে ব্যয়িত করা হইয়াছিল। ১৯১৫। ১৬ খৃঃ অব্দে রিজার্ভ সেনেটারি কার্য্যে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়; এবং ২,৯৯,৫৬৮ টাকা ব্যয়িত করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি দ্বারা সংগৃহীত ২২, ৯২, ৪২৯ টাকা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। এই রিপোর্টে প্রকাশ, পল্লী গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, পুরাতন জলাশয়ের সংস্কার-সাধন, ড্রেণ্-পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আলোচ্য বর্ষে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

যাহাহউক আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে বিশেষ রূপ মনোযোগী সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উত্তরোত্তর যেরূপ ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাহাপেক্ষা আরও অধিক ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। আমাদের নিজেদেরও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাশীল হইতে হইবে। সে চেষ্টাশীল হইতে হইলে, কিন্তু কিছু অর্থব্যয়ের আবশ্যক। পল্লী-সংস্কারের জন্য জেলাবোর্ড বা লোকাল-বোর্ড গুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, যাহা পার, সাধ্যমত গ্রাম্য চাঁদা তুলিয়া, তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করাইবার জন্য,—জঙ্গল-পরিষ্কার করাইবার জন্য,—রাস্তা গুলি সুসংস্কৃত করিবার জন্য তাঁহাদিগের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, তবেই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া হ্রাস পাইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জলাশয়ের সংস্কার,—বন পরিষ্কার প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত নহেন, প্রতি বৎসর নানা পল্লীতে চিকিৎসক প্রেরণপূর্ব্বক যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন-বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আমাদিগের নিকট নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ এবং তাহার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ সন্দেহ নাই;—কিন্তু আমাদের মনে হয়,—আমরা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি এ সময় আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অধিকতর শুভজনক হইতে পারে। প্রত্যহ একটু-একটু তুলসীর রস বা সিউলির পাতার রস সেবন করা—এ সময় মন্দ ব্যবস্থা নহে। অবস্থায় কুলাইলে সপ্তাহে ২।৩ দিন একটু-একটু "মকরধ্বজের" সহিত ঐ দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি ব্যবহার করিলে আরও উপকারের সম্ভাবনা। কুইনাইন-ব্যবহারে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে আপাততঃ রক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার অপব্যবহারে পরিণামে দেহ-মন্দির নানারূপ ব্যাধির আকর ভূমি হইয়া থাকে; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই, বিশেষতঃ তুলসীর রস—বায়ু এবং কফ ধাতুকে নষ্ট করিয়া থাকে বলিয়া ইহা সেবনে অন্যান্য অনেক রোগের আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। সিউলি বা সেফালিকা পত্রের রস কটু ও তিক্ত এবং উষ্ণবীর্য্য, এজন্য ইহা জ্বরনাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত। ম্যালেরিয়া-প্রবণ-দেশের অধিবাসীগণকে এ দুইটি দ্রব্যের যে কোনটি বা ঐ দুইটি দ্রব্যের এক বেলা একটি ও

অপর বেলা আর একটি সেবন করিবার জন্য আমরা পরামর্শ প্রদান করিতেছি।

ম্যালেরিয়া আরম্ভের সময় বর্ষার অন্ত কাল। বর্ষা ঋতুতে দেহে শীতাধিক্য ও পিত্ত সঞ্চিত হয়। এই ঋতুর অন্তকালে ঐ সঞ্চিত পিত্ত সহসা প্রখর-মার্ত্তণ্ড-কিরণ পাইয়া প্রকুপিত হইয়া থাকে। এজন্য এ সময় তিক্ত-দ্রব্য আহার করিলে এবং যাহাতে নিত্য কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, তাহার জন্য রাত্রে শয়ন-কালে সপ্তাহে ২।৩ দিন অর্দ্ধ তোলা হরিতকী চূর্ণ, অর্দ্ধ তোলা চিনি এবং এক ছটাক গরম জল একত্র মিশাইয়া পান পূর্ব্বক কোষ্ঠ-পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

পল্লীর অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, ইঁহারা ক্রমাগত ভুগিয়া-ভুগিয়া এরূপই সহনশীল হইয়া পড়িয়াছেন যে, অনেক সময় তাঁহাদের নিকট ম্যালেরিয়া রোগটি যেন উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে। জ্বর হইল—পড়িয়া থাকিলেন, জ্বর ছাড়িল—কুইনাইন সেবন করিলেন,—অনেক ক্ষেত্রে ইহাই হইয়াছে—তাঁহাদিগের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা হইতেই ত দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। এইরূপ ভাবে ভুগিয়া-ভুগিয়া ক্রমশঃ জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে। ম্যালেরিয়া কখনই উপেক্ষনীয় নহে, যাহাতে ম্যালেরিয়া-বিষে শরীর আক্রান্ত হইতে না পারে—প্রথমতঃ তাহাই করা কর্ত্তব্য, সেরূপ চেষ্টা করিয়াও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সুচিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হইবার চেষ্টা করা উচিত। রোগ মাত্রই উপেক্ষণীয় নহে। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

"জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যঃ স্যান্নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদ।
বহ্নিশস্ত্র বিষৈস্তুল্য স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥"

অর্থাৎ—রোগ উৎপত্তি হইবামাত্র চিকিৎসা করাইবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেনা, কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় অল্প পরিমিত হইয়াও বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে।

আমরা সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে আরও আলো-চনা করিব ইচ্ছা রহিল।

পশ্বায়ুর্ব্বেদ।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ ও গবায়ুর্ব্বেদ।

সেকালে কেবল মানুষের জন্যই "আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র" উদ্ভাবিত হয় নাই। আর্য্যঋষিগণ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির জন্যও "আয়ু-র্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে যে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার যুগপৎ সাধনা চলিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না।

বিশ্ব বিশ্রুত কীর্ত্তি—মহাত্মা জগদীশ চন্দ্র

বসু * উদ্ভিদের প্রাণ-সত্তা সপ্রমাণ করিয়া, বিজ্ঞান-বাহন য়ুরোপকেও আজ যে বিস্মিত করিয়াছেন, বহুযুগ পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণও এ উদ্ভিদ-রহস্য অবগত ছিলেন। মনু বলিয়াছেন—

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ"

অর্থাৎ বৃক্ষাদিরও অন্তঃসংজ্ঞা আছে, তাহারাও সুখ-দুঃখ-অনুভব করিতে পারে। এইজন্যই আর্য্য-শাস্ত্রে বৃক্ষাদির শ্রাদ্ধ-তর্পণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি বৃক্ষকেই ঋষিগণ দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদের পালন, বর্দ্ধন, রোগনির্ণয় ও তাহার প্রতিকারের জন্য, "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ" রচিত হইয়াছিল। "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" "কেদারকল্প" "কৃষি পরাশর" প্রভৃতি গ্রন্থে আপনারা—"বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের" আভাষ পাইবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আপনাদের কাছে আমি "পশ্বায়ুর্ব্বেদের" পরিচয় প্রদান করিব।

গো, অশ্ব ও হস্তী—মানবের কর্ম্মক্ষেত্রে এই তিনটী পশুর উপযোগিতা বড় বেশী। প্রাচীন ভারতে এই তিন শ্রেণীর পশুর যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঋষিগণ—এই তিন শ্রেণীর পশুর জন্য "চিকিৎসা-বিধি" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। * কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীনকালের গো-চিকিৎসা বিষয়ক কোনও গ্রন্থই আমরা এ পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে পারি নাই। কেবল "অগ্নিপুরাণ" প্রভৃতি পুরাণে—গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে দুই চারিটী উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। মহাভারত পড়িলে আমরা জানিতে পারি,—পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব একজন প্রসিদ্ধ "গো-বৈদ্য" ছিলেন। সহদেব যে গো-চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়না। আমাদের ধারণা, পুরাকালে গো-চিকিৎসার জন্য "গবায়ুর্ব্বেদও" রচিত হইয়াছিল, অবহেলায় তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গো-জাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত ভারতের উন্নতি-অবনতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। "গো-পালন" একদিন আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। গো-বৃষ,—ঋষি রচিত-পুণ্য-সংসারে-গার্হস্থ ধর্ম্মের অনেক সাহায্য করিত, তাই ভারতবাসী একদিন গো-জাতিকে দেবতার যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখনও পিতৃকার্য্যে "বৃষোৎসর্গ" আভিজাত্য-প্রকাশে "গোত্রের" উল্লেখ, দুর্ব্বা-চন্দনে "হোমধেনুর" আমন্ত্রণ—ভারতে গো-জাতির প্রতি শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়া আসিতেছে! জানিনা, কোন্ মহাপাপে —"গো-দ্যুলোক প্রতিষ্ঠিতঃ" এই মহতীবাণীর মর্য্যাদা এদেশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে! যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ একদিন গো-চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করিয়া, ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বংশের বংশধর আজ গো-বৈদ্যকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। গো-চিকিৎসা এখন হেয়তম নীচ কার্য্য। পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণ—গোরুর চিকিৎসা

---

* ডাক্তার সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার রচিত "প্ল্যান্টরেস্পন্স" নামক পুস্তকের ভূমিকার মধ্যভাগে এবং উপসংহারে বলিয়াছেন, "বৃক্ষের নানাবিধ গতিবিধি, পরিপাক বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্য্য ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, ঐ সমস্ত কার্য্য জীবনী-শক্তির দ্বারা পরিচালিত নহে,—ইহার জন্য একটা অতীন্দ্রিয় জীবনীশক্তির প্রয়োজন হয় না।" যাহা হউক এই প্রবন্ধের লেখকের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। আঃ সং

করিতেন। চিকিৎসা করিতে গিয়া—গো-বধ করিয়া ফেলিলেও চিকিৎসাকারী প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতেন না। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

দাহচ্ছেদং শিরাবেধং প্রযত্নৈরুপকুর্ব্বতাং।
দ্বিজানাং গো হিতার্থায় প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
যন্ত্রেণ গো চিকিৎসায়াং মূঢ়গর্ভ বিদারণে।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায়—প্রাচীন আর্য্যগণ গাভীর হিতের জন্য অতি যত্নের সহিত গো-শরীরে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিতেন।

অশ্বায়ুর্ব্বেদ।

প্রাচীন কালে "শালিহোত্র" নামে এক জন ঋষি ছিলেন। ইনি একজন অদ্বিতীয় "অশ্ববৈদ্য" বলিয়া তৎকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "শালিহোত্র" প্রণীত অশ্ব-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। প্রয়োজন মত কেহ কেহ এই বিশাল গ্রন্থের দুই একটী অধ্যায় মুদ্রিত করিয়াছেন। শীঘ্রই ইহার পূর্ণাবয়বে প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

বৈদ্য-কুলতিলক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, "বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি" হইতে দুই খানি দুষ্প্রাপ্য অশ্বচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার একখানি চতুর্থ পাণ্ডব শ্রীমৎ নকুল রচিত, অপর খানির নাম—"অশ্ব বৈদ্যক।" এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম—জয়দত্ত। নকুল যে একজন অশ্ব চিকিৎসক ছিলেন, একথা বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দুই শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং নকুল রচিত অশ্ব-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি প্রচার করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় এদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এজন্য ভারতবাসী মাত্রেই উমেশ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী বিস্তৃত সূচী সংযোজিত করিয়াছেন। এই সূচী—তাঁহার অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানের অবিনশ্বর উদাহরণ। সহৃদয়তা, অন্তদৃষ্টি, বহু-অধ্যয়ন, উদারতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও লিপি-কুশলতা—সাহিত্য জগতে উমেশচন্দ্র এই সকল গুণের অধিকারী। তাঁহার এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুশীলন জাত সূচী পত্রে আমরা অনেক জটিল-দুর্ব্বোধ্য গুরুতর সমস্যার মীমাংসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সাধনা, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার অতীতের প্রতি অনুরাগ, তাঁহার মৌলিক গবেষণা শক্তি—সমগ্র বাঙ্গালীর আদর্শ। দুঃখের বিষয়—এরূপ অক্লান্ত শ্রম ও অটুট অধ্যবসায়ের যথার্থ মূল্য—এদেশ এখনও বুঝিতে পারে নাই।

প্রাচীন ভারতে অশ্ব-চিকিৎসার অত্যন্ত প্রচলন ছিল। অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ক অনেক গুলি গ্রন্থের আমরা নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ভবিষ্যতে পৃথক্ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

বিদর্ভাধিপতি নল—অশ্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। অশ্বের প্রতিপালন সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে অশ্ব-চিকিৎসার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে উমেশ বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক দুই খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইতঃপূর্ব্বে, "জন্মভূমি" পত্রে—বৌদ্ধযুগের অশ্ব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে

অশ্ব রোগের অনেকগুলি মুষ্টিযোগও উদ্ধৃত হইয়াছিল।

গজায়ুর্ব্বেদ।

ভারতে "গজায়ুর্ব্বেদের"ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হস্তী-চিকিৎসার অনেক গুলি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল। "অগ্নি-পুরাণে"—একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

পালকাপ্যোঽঙ্গ রাজায় গজায়ুর্ব্বেদ মব্রবীৎ।
শালিহোত্রঃ সুশ্রুতায় হয়ায়ুর্ব্বেদ মুক্তবান্॥

ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি, "পালকাপ্য" নামক ঋষি অঙ্গাধিপতি লোমপাদকে গজায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আর মহর্ষি শালিহোত্র সুশ্রুতের নিকট "হয়ায়ুর্ব্বেদ" কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শালিহোত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইনিই "অশ্বায়ুর্ব্বেদের" প্রথম প্রচারক, কিন্তু ইঁহার উপদেশ-শ্রোতা 'সুশ্রুত' আর—সংহিতাকার "সুশ্রুত" —একই ব্যক্তি কিনা, তাহা বলা যায়না। আপাততঃ এ সকল তর্কে প্রয়োজন ও নাই। এখন "গজায়ুর্ব্বেদের" কথাই বলি।

"পালকাপ্য"—প্রাচীন ঋষি।—রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে পারি "অঙ্গাধিপতি" —লোমপাদ, রাজা দশরথের পরমাত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন। অযোধ্যানাথ দশরথ নিজ কন্যা "শান্তা"কে লোমপাদের হস্তে "দত্রিমা" রূপে সমর্পণ করেন। রাজা লোমপাদ—বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন। দশরথ—চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে ধরণীতে আবির্ভূত হন। এ সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের প্রমাণ,—

"চতুর্ব্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা।
সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ॥"

এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়—"পালকাপ্য" দশরথের সমসাময়িক। কেননা দশরথ-সুহৃদ্ অঙ্গাধিপ লোমপাদকেই তিনি গজায়ুর্ব্বেদ শুনাইয়া ছিলেন। এতদ্দ্বারা আমরা পালকাপ্য প্রণীত "গজায়ুর্ব্বেদের" প্রাচীনত্বের নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ রায় বিদ্যানিধি যখন "অনুশীলন" নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন, তখন সময়ে সময়ে আমি তাহাতে দুই একটী কবিতা লিখিতাম। সেই সূত্রে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কলিকাতায় যাইলে আমিও তাঁহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতাম। ক্রমে তাঁহার উদারতায় আমাদের মুখের আলাপ ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মধ্যস্থতায়—স্বর্গীয় মহাত্মা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে—"সাহিত্যসভার" এক বিশেষ অধিবেশনে, আমি এক মহাপুরুষের কাছে পরিচিত হই। তিনি, সুসঙ্গের অধিপতি। আজ তিনি স্বর্গে—এ মর্ত্ত্যের মাটীর কথা বোধ হয় তাঁহার মনে নাই, আমি কিন্তু এখনও সেই চরিত্র-মাধুর্য্যের অপরাজিত বীরকে অন্তরে অন্তরে পূজা করি। সুসঙ্গাধিপতি একদিন আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ তুল্য ভবনে—আমি সর্ব্ব প্রথম পালকাপ্যের "গজায়ুর্ব্বেদ" চক্ষে দেখিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি মুদ্রিত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে—পুণার "আনন্দাশ্রম" হইতে শ্রীযুক্ত মহাদেব চিমনজী আপ্তে মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত। মহারাজ যত্নের সহিত পুস্তকখানি আমায় দেখাইয়াছিলেন এবং আমাকে তাহার বঙ্গানুবাদ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন।

অনুবাদ আরম্ভ ও হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই কালের ইঙ্গিতে মহারাজ পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ পশু-চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—একে একে সেগুলি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ্যে প্রচার করিবেন। হায়! তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাবণের স্বর্গ-সোপান-নির্ম্মাণের কল্পনার মত চিরদিন ব্যর্থ হইয়াই রহিল !!

দেবানাং প্রিয়দর্শী রাজা অশোক পশুর জন্য হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার আমলে—ভারতে পশু-চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এখনও ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভে, শিলাপট্টে, তাম্রশাসনে,—ইতর জীবের প্রতি অশোকের অসীম করুণার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ সুসঙ্গ—সেই বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের মতই—"অহিংসা পরম ধর্ম্মের"' 'মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল—ভারতে আবার পশ্বায়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করা। মহারাজের পিতৃব্য ৺রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ "গো-পালন" ও "অশ্বতত্ত্ব" নামক দুইখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুস্তকদ্বয়ের রচনা-কৌশলের মধ্যে মহারাজেরও দুইখানি সুনিপুণ হস্তের সন্ধান পাওয়া যায়। কলিকাতার উদ্দেশ্য-হীন কোলাহল, নিরানন্দ ধূমময় আকাশ এবং হৃদয় শূন্য সমাজের মধ্যে থাকিয়াও মহারাজ পশু-রক্ষার কথা ভুলেন নাই।

মহারাজের গ্রন্থাগারে—আর একখানি হস্তি-চিকিৎসার পুস্তক দেখিয়াছিলাম। সেখানি মাদ্রাজের ত্রিবেন্দ্রম্ নগর হইতে প্রকাশিত। তাহাতে হস্তী চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"করি-কৌতুকসার" "মাতঙ্গদর্পণ" "মাতঙ্গলীলা" "হস্তি-বিলাস" "গজেন্দ্র-চিন্তামণি"—ইত্যাদি। এই সকল পুস্তকের মধ্যে দুই একখানি মহারাজ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা হস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি। আশা করি মহারাজের কোনও যোগ্য বংশধর তাহা মুদ্রিত করিয়া মহারাজের স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করিবেন। *

"বারাহী-সংহিতা" "গর্গসংহিতা" "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" "বসন্তরাজ" "রাজবল্লভ" "জ্যোতির্নিবন্ধ" "ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ" "অগ্নিপুরাণ" "গরুড়পুরাণ" প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে হস্তি-চিকিৎসার বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা ঐ সকল গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন। য়ুরোপে হস্তী জন্মেনা, সুতরাং পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত হস্তি-চিকিৎসা বিষয়ক কোন গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে—তাহাও ভারতপ্রবাসী সাহেব কর্তৃক লিখিত। তন্মধ্যে Gilchrist &c. Major Evans কৃত গ্রন্থই উল্লেখ যোগ্য। আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত কতকগুলি হস্তি চিকিৎসার গ্রন্থ আছে, এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত সংহিতার অনেকটা অনুকরণেই লিখিত।

এইবার পালকাপ্য রচিত গজায়ুর্ব্বেদ

---

* মহারাজের যোগ্য বংশধর প্রিয়দর্শন ভূপেন্দ্র চন্দ্র এবার আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমার ভরসা আছে—শ্রীমান্ নাম শেষ পিতৃদেবের ও সুসঙ্গের রাজবংশের গৌরব অক্ষম রাখিবেন।

নামক বিরাট গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই গ্রন্থ ১৬০টী অধ্যায় যুক্ত এবং "মহা-রোগ স্থান" "ক্ষুদ্র রোগ স্থান" "শল্যস্থান"ও "উত্তর স্থান"—এই চারিভাগে বিভক্ত। ইহার "মহারোগ স্থানে" ১৮টী, "ক্ষুদ্র রোগ স্থানে" ৭২টী, "শল্যস্থানে" ৫৪টী, এবং উত্তর স্থানে ৩৬টী অধ্যায় আছে। ইহার ভাষাও "চরক সুশ্রুতাদি" আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতার ভাষার মত—গদ্য-পদ্যময়ী। সমগ্র গ্রন্থে দুই হাজারেরও বেশী শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। পালকাপ্যের মতে—হস্তীদেহে ৩১৫ প্রকার ব্যাধির আক্রমণে সম্ভাবনা। মহর্ষি—ধীর-গম্ভীরভাবে ৩১৫ প্রকার ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসাবিধি বুঝাইয়া দিয়াছেন। "শল্য-স্থানে" পালকাপ্য, হস্তিদেহে প্রযোজ্য যে সকল শস্ত্র-যন্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা প্রায় "সুশ্রুত-সংহিতায়" বর্ণিত শস্ত্র-যন্ত্রাদির অনু-রূপ। ত্রিংশৎ অধ্যায়ে হস্তীর অবয়বাদির পার্থক্য এবং ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, বিস্রাবণীয়, বিদারণীয় এষ্য ও সীবনীয়াদি শস্ত্রোপচার লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবাক্ হইতে হয়। মহর্ষির রচনার নমুনা স্বরূপ—আমরা "গজায়ুর্ব্বেদের" একটী মাত্র অধ্যায় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

অথোবাচ ভগবান্ পালকাপ্যঃ ইহ খলু ভো হস্তিনামাগন্তবো দোষসমুত্থাশ্চ ব্রণ-বিধয়ো বহুবিধা ভবন্তি। তেষাং দোষ-প্রশমনার্থং শস্ত্রবিধানং সংস্থানপ্রমাণতশ্চ বক্ষ্যামঃ।

তত্র কুণ্ঠং খরধারং বক্রং হ্রস্বমনতিস্থূলং দীর্ঘমানতং খণ্ডং বর্জ্জয়েৎ। গুণবদ্বিপরীতং ন চাতিনিশিতং শস্ত্রমবচারয়েৎ।

তত্র তীক্ষ্ণায়সা বিধিবন্নিষ্পন্নেন কুশলঃ কর্ম্মারঃ শস্ত্রাণি কুর্য্যাৎ। তদুত্তমেন হি দ্রব্যে-ণোত্তমেন চাচার্য্যেণ ক্রিয়য়া চোত্তময়া কৃতং শস্ত্রং কার্য্যং সাধয়েদিতি। তস্মাৎ প্রযত্নঃ কার্য্যঃ শস্ত্রাণামুত্তমানাং করণে।

তত্র শস্ত্রাণি দশ নাম সংস্থানানি ভবন্তি। তদ্ যথা,—বৃদ্ধি পত্রং, কুশপত্রম্, ব্রীহিমুখম্, মণ্ডলাগ্রম্, কুঠারাকৃতি, বৎসদন্তম্, উৎপল পত্রম্, শলাকা, সূচী, রম্পকশ্চেতি কাকজাম্ববতাপিকা দর্ব্যাকৃতয়শ্চেতি। এতান্যগ্নিকর্ম্মবিধানে চত্বারি চান্যানি শল্যোদ্ধরণানি। যথাযোগং সিংহ-দন্ত্রং গোধামুখং কঙ্কমুখং কুলিশমুখঞ্চেতি। তিস্রএষিণ্যঃ। একবিংশতিরেব বা অন্যো ময়ানি সাধনানি ভবন্তি। তেষাং সংস্থানং প্রমাণং কর্ম্মাণি বক্ষ্যামঃ—তত্র দশাঙ্গুল প্রমাণং বৃদ্ধিপত্রং ষড়ঙ্গুল প্রমাণং বৃত্তং। চতুরঙ্গুল-প্রমাণং পত্রম্। ত্র্যঙ্গুল-বিস্তীর্ণং পাটনার্থং ছেদনার্থঞ্চেতি। ষড়ঙ্গুলবৃত্তমর্দ্ধা-ঙ্গুলং সর্ব্বতঃ। তৎ পূর্ণচন্দ্রাকৃতিরগ্রে মণ্ডলা-গ্রম্। লেখনার্থমক্ষো ব্রীহিমুখং। উৎপল পত্র-মষ্টাঙ্গুলমেবৈকম্। তচ্চাষ্টাঙ্গুলপ্রমাণং। অধ্য-র্দ্ধাঙ্গুলবিস্তৃতমুভয়তো ধারম্ (ব্রীহিমুখা-কৃতি ব্রীহিমুখং মুঞ্জভেদনার্থং ছেদনভেদানার্থ-ঞ্চেতি। নবাঙ্গুলং কুশপত্রং। পঞ্চাঙ্গুলং বৃত্তম্। চতুরঙ্গুলং পত্রং, অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলবিস্তৃত-মুভয়তো ধারম্।) কুশপত্রাকৃতিগম্ভীর-পাকভেদনার্থং ষড়ঙ্গুলবৃত্তম্। অধ্যর্দ্ধাঙ্গুলং পত্রম্। পূর্ণচন্দ্রাকৃত্যগ্রমণ্ডলাগ্রম্। লেখনার্থ মক্ষো ব্রীহিমুখমুৎপলপত্রং ভেদনার্থং কুঠারাকৃতি কুর্য্যাৎ। কুঠারশস্ত্রং প্রচ্ছেদ-নার্থম্। বৎসদন্তাকৃতি বৎসদন্তং দশাঙ্গুলম্। একৈকমধ্যর্দ্ধাঙ্গুলমুখম্। এবমেতানি চ ত্রীণ্যপি যথাযোগং প্রচ্ছন্নার্থং, সূচী সেবনার্থং।

অষ্টাঙ্গুল, নাগদন্তাকৃতি ত্র্যস্রা চতুরস্রা বা দৃঢ়া সমাহিতা সমা বা শলাকা বনে বস্ত্র বিধৃত্যর্থম্। রম্পক ত্র্যঙ্গুল মুখো দশাঙ্গুল বৃত্তঃ পাদ শোধনার্থঙ্নখচ্ছেদনার্থঞ্চেতি। এষণী দশাঙ্গুলা। বিংশত্যঙ্গুলা ত্রিংশদঙ্গুলা যথাযোগ মঞ্জন শলাকাকৃতিঃ শ্লক্ষ্ণা সমাচৈবমেতা স্তিস্র এষণঃ প্রমাণতঃ কার্য্যাঃ। কোরন্টকপুষ্পাকৃতি মুখনেত্র তাম্রায়সং ষোড়শাঙ্গুল মনুপূর্ব্বং ব্রণানাং প্রক্ষালনং কুর্য্যাদ্বড়িসং চক্রাগ্রমষ্টাঙ্গুলপ্রমাণমক্ষোঃ পটলোদ্ধরণার্থঞ্চেতি।

তত্র শ্লোকঃ—

যথাক্রান্তেবমেতানি শস্ত্রাণি বিধিবদ্ ভিষক্।
কারয়িত্বা যথাযোগং কুর্য্যাদ্ব্রণবিদারণম্।

ইতি শ্রীপালকাপ্যে হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ মহা প্রবচনে তৃতীয়ে শল্যস্থানে ত্রিংশঃ শস্ত্র বিধিরধ্যায়।

পালকাপ্যের "গজায়ুর্ব্বেদ যে বিরাট আয়ুর্ব্বেদেরই এক অবিচ্ছিন্ন অংশ—ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তিনি—সহানুভূতি পূর্ণ করুণ-হৃদয়ে—হস্তীর প্রত্যেক অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, অস্ত্র-সাধ্য রোগে—শস্ত্র-প্রয়োগের কৌশলও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসার জন্য হস্তীর নানাবিধ বন্ধন-ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন, দন্তোৎপাটন, মূঢ়গর্ভ বিদারণ, কবল প্রদান, স্বেদকর্ম্ম, বস্তিকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, নস্য, ধূপ, অঞ্জন প্রভৃতি বিষয়েও বিশদ উপদেশ দিয়াছেন। হস্তিশালা নির্ম্মাণ, হস্তি পালন, অতি দক্ষতার সহিত বুঝাইয়াছেন। হস্তি-তত্ত্ব বিষয়ে এমন কোনও তথ্য নাই,—যাহা এই বিপুল কলেবর পুস্তকে পাওয়া যায় না। যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যে ইহার এক একটী অধ্যায় যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণ পুণা হইতে আনাইয়া,—এই "গজায়ুর্ব্বেদ" একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।

গারুড় বিদ্যা।

"রারাতী সংহিতা"তে গৃহপালিত ছাগমেষাদি পশুর প্রকৃতি ও রোগ প্রতিকারার্থ সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দয়াময় ঋষিগণ—কোনও জীবকেই উপেক্ষা করেন নাই। যে সকল পশু—রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পাংশুস্তূপে পড়িয়া মৌন ভাষায় মৃত্যুকে আহ্বান করিত, আর্য্যঋষি তাহাদিগকেও ক্রোড়ে তুলিয়া সুধাসেচনে সঞ্জীবিত করিতেন। আকাশের বৃষ্টিধারার মত—সে করুণা স্থান-পাত্রের বিচার করিত না।

প্রচীন ভারতে গারুড়-বিদ্যারও প্রচুর উন্নতি হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগার হইতে একখানি অভিনব সংস্কৃত পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্যেনপক্ষীপ্রতিপালন ও তদ্দারা মৃগয়া-শিক্ষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে শ্যেন পক্ষীর রোগ ও তৎ প্রতিকারের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা—কমসুনাধিপতি শ্রীমদ্ রাজা রুদ্রদেব। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় রুদ্র দেবের কাল নিরূপণের জন্য—অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন—যাঁহাদের জীবন ব্রত, পশ্বায়ুর্ব্বেদের প্রতি আমি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীন পুস্তক গুলির প্রচার ও তাহার বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতএব, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের শক্তিশালী পরিচালকগণ—যদি আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্বায়ুর্ব্বেদের ও অধ্য-

য়ন, অধ্যাপনা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ অকস্মাৎ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

আমার মত নগণ্য ব্যক্তির লিখিত—এই অকিঞ্চিংকর প্রবন্ধ—যাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত দয়া করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অতি ধৈর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, অদ্য এইখানেই ইতি করিলাম। *

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়
কাব্যতীর্থ, কাব্যকণ্ঠ যোগবিশারদ।

* যদিও আমাদের দেশে এখন গো-চিকিৎসার কোনও ধারাবাহিক নিবন্ধ সংগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি পুরাণে যাহা পাওয়া যায়—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে—তাহাই যথেষ্ট। সেটুকু রক্ষা করাও কর্ত্তব্য। অযত্নেই আমাদের অনেক অমূল্য রত্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে হইলে পশ্বায়ুর্ব্বেদকেও রক্ষা করিতে হইবে। সুসঙ্গের মহারাজের মুখেই শুনিয়াছি—Colonel L. A. Waddel নামক একজন বিদ্যোৎসাহী সমদর্শী ইংরাজ তিব্বতের লাসা নগরী হইতে সহস্রাধিক হস্তলিখিত (Mss) পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেগুলি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসস্থিত পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকাশ—এই সকল পুঁথির অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা। ইহার মধ্যে পশু চিকিৎসার কোনও গ্রন্থ আছে কিনা জানিনা। কালে এই সকল গ্রন্থ হইতে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইবে, কিন্তু আমরা সে গৌরবের ফলভাগী হইব কি না বলিতে পারি না।

তিল।

নামটী ঠিক মনে পড়িতেছেনা—সেদিন একখানি মাসিক পত্রে দেখিলাম, একজন লেখক তিল বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই লেখক বলিয়াছেন, —"তিল ভারতবর্ষের জিনিষ নহে।" স্বীয় মত সমর্থনের জন্য লেখক দু' একটী প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন য়ুরোপীয় উদ্ভিদ বেত্তার মত—তিল আফ্রিকা দেশ জাত শস্য,—আরবীয়গণ ভারতবর্ষে তিলের আমদানি করিয়াছিলেন।

বিদেশীরা যাহাই বলুন—কিন্তু আমাদের হিন্দু লেখক কোন্ প্রাণে বলিলেন—"তিল এদেশের জিনিষ নহে" ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে তিল শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিল না হইলে আর্য্য ঋষির দৈব কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য—কোন কার্য্যই হইত না। আমরা যে "তৈল" ব্যবহার করি—সেই 'তৈল' শব্দই তিল হইতে উৎপন্ন। সর্ষপ, এরণ্ড, নারিকেল প্রভৃতি ফলের শস্য জাত স্নেহ মাত্রকেই আমরা 'তৈল' নামে অভিহিত করিয়া থাকি, পূর্ব্বে কিন্তু তিল জাত স্নেহকেই "তৈল" বলা হইত। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ, সেই আয়ুর্ব্বেদে তিলের এবং তিল জাত তৈলের আময়িক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের চর্ম্মোপরি তিলাকৃতি এক প্রকার চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায়—কবি-

রাজেরা তাহাকে "তিল কালক" বলেন! তিল কাষ্ঠের ক্ষার ঐ চর্ম্ম রোগের একমাত্র ঔষধ। তিলের প্রলেপে শূল রোগ ভাল হয়। তিলের কল্ক ছাগীদুগ্ধ সহ সেবনে—রক্তাতিসারের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। তিল বাটা নবনীত সহ স্বেদ দিলে অর্শরোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ অনেক রোগেই তিলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়। তিল-তৈলের ত কথাই নাই। "গুড়ূচ্যাদি তৈল" "মধ্যম নারায়ণ তৈল" 'বিষ্ণু তৈল" প্রভৃতি সকল তৈলই তিল তৈল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ও তিল কাষ্ঠের জাল দিয়া কবিরাজ মহাশয়েরা "অভয়ালবণ" নামক প্লীহারোগের একটী মহৌষধ প্রস্তুত করেন। আর কত নাম করিব? তিল যে ভারত জাত শস্য—এ কথার প্রমাণ আপনারা হিন্দুর বেদ, পুরাণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্র গ্রন্থেই দেখিতে পাইবেন। তথাপি যদি কেহ বলেন,—তিল আফ্রিকার শস্য, তাহা হইলে আমি বলিব—আগে ঋষিরা সমস্ত এসিয়াটাকেই ভারতবর্ষ বলিয়া ধরিতেন। তথনকার ভারত বিরাট-বিশাল-স্থান ছিল,—এখন ত্রিকোণাকৃতি ভারতের নাম "ইণ্ডিয়া"।

ভারতের ঋষিগণ বলেন,—তিল তিন প্রকার,—শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত। এই ত্রিবিধ তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

স্নানের অঙ্গতা বুঝাইতে হইলে হিন্দুরা বলেন,—"তিল স্নানং।" প্রাচীন হিন্দুদের পাক রাজ্যেশ্বর প্রভৃতি পুস্তকে তিল হইতে উৎপন্ন অনেক প্রকার খাদ্য ও মিষ্টান্নের বর্ণনা আছে। "তিল পিষ্টক" "তিল ভৃষ্ট" "তিলান্ন" "তিলহোম" "তিলধেনু" "তিলকাঞ্চন" তিললড্ডুক প্রভৃতি শব্দ—কোন্ ভারতবাসী না অবগত আছেন? গ্রীক-পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া তিলের অস্তিত্ব দেখিয়া গিয়াছেন। সে আজ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্লিনি (Plini) বলেন,—সিন্ধ দেশ হইতে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া ভারত জাত তিল য়ুরোপে চালান যাইত।

পূর্ব্বে গুজরাট প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তিল-তৈল উৎপন্ন হইত, এবং ঐ তৈল বিদেশে প্রেরিত হইত—খাস্ ইংরাজ একথা স্বীকার করিয়াছেন।

"আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে শ্বেত ও কৃষ্ণ—এই দুই জাতীয় তিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে—প্রচুর পরিমাণে তিলের চাষ আবাদ হইত। বাহুল্য ভয়ে আমি অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিবনা। তবে তিল যে ভারতেরই সম্পত্তি, ধান্যাদি শস্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ যে তিলের ও চাষ করিতেন,—ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

তিল শিশির-শস্য অর্থাৎ শীতকালেই ইহা জন্মিয়া থাকে। বেলে মাটিতে তিল রোপণ করিতে হয়। কিন্তু কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণ তিল রোপণ সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একমত নহেন। মান্দ্রাজের লোক ফাল্গুনের শেষে তিল রোপণ করে। রোপণের নিয়ম—প্রথমে জমিতে ২।৩ বার লাঙ্গল দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর সেই জমি বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেলে—তাহাতে তিল রোপণ করিতে হয়। এক বিঘা জমির পক্ষে—পাঁচ পোয়া বীজই যথেষ্ট। বপনের ৮।১০ দিন পরে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। অঙ্কুর বাহির হইলে, চারা

একটু বড় হইলে, মাঝে মাঝে জমি নিড়াইয়া দিতে হয়। গাছ বড় হইলে, তাহাতে ফুল ধরে। সেই ফুল কবিকুল কর্ত্তৃক সুন্দরীর নাসিকার সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

ফুল হইতে ক্রমে শুঁটী জন্মে। এই শুঁটীর ভিতর তিল থাকে। শুঁটী পাকিলে গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। এই সময় গাছ কাটিয়া এক স্থানে গাদা দিতে হয়। গাছ গুলি বেশ শুকাইয়া গেলে, আছড়াইয়া তিল বাহির করিয়া লইতে হয়।

বঙ্গদেশে মাঘ মাসের প্রথমেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ঢাকা জেলার লক্ষীয়া নদীর ধারে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে এক বিঘা জমিতে দেড়সের তিল ও দশ সের আমন ধান্য এক সঙ্গে রোপণ করা হয়। এই উপায়ে প্রতি বিঘা হইতে ৩ মণ তিল পাওয়া যায়। সেখানকার লোকের বিশ্বাস, ধান্যের সঙ্গে চাষ করিলে তিল নাকি ভাল রকম জন্মায়।

সিন্ধু দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিলের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম দেশে—তুলার সহিত তিলের আবাদ হয়, সেখানে তিলের তৈল খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এদেশের লোক আশ্বিনের শেষে তিল রোপণ করে।

ঘানীগাছের সাহায্যে তিল হইতে তৈল বাহির করা হয়। কাঁচা তিলের তৈল কিছু অপরিষ্কার হয় বলিয়া তৈল ব্যবসায়ীগণ প্রথমে তিলকে জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। সিদ্ধ করিলে খোসার রং আর কালো থাকে না। তা'র পর তিলকে রৌদ্রে শুকাইয়া তৈল বাহির করিলে, সেই নিষ্কাষিত তৈলের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশে তিলের সহিত মসিনা প্রভৃতি ভেজাল দিয়া তৈল বাহির করে।

আসল তিল-তৈলের বর্ণ হরিদ্রাভ, ইহার গন্ধ কখনও বিকৃত হয় না। তিলে olcin পদার্থ শতকরা ৭৫ ভাগ বর্ত্তমান থাকে। যদি কোনও তৈলে দশভাগ তিল-তৈল মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে ১ ড্রাম তৈল লইয়া, ঐ তৈলে ১ ড্রাম সালফিউরিক এসিড্ ও নাইট্রিক এসিড্ মিশাইলে মিশ্রিত দ্রব্য হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে।

এদেশে পাক কার্য্যে, ঔষধে, সাবান প্রস্তুত করিতে, মাখিবার জন্য ও প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য তিল-তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতে অনেক সময় অলিভ অয়েলের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধার্থে—কৃষ্ণ তিলের তৈলই উত্তম। কোন কোন দুষ্ট ব্যবসায়ী ঘৃতের সহিত তিল-তৈল ভেজাল দেয়। এদেশে যে অলিভ অয়েলের আমদানী হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক প্রায় বিলাতে প্রস্তুত তিল-তৈল। তিল-তৈল—এদেশের বহু গন্ধ দ্রব্যের মূল উপাদান। একগুণ ফুল, তিনগুণ তৈল একত্রে বোতলে পুরিয়া ৪০ দিন পচিলে, ঐ ফুলের গন্ধ তিল-তৈলে মিশ্রিত হয়। এই উপায়ে আমি ফুলেল তৈল প্রস্তুত করিয়াছি। আতর প্রস্তুত করিতেও তিল তৈলের আবশ্যক হয়। ফুলেল তৈল প্রস্তুতকারীরা তিল ও ফুল স্তরে স্তরে সাজাইয়া, তিল পুষ্পগন্ধ অনুপ্রবিষ্ট হইলে, সেই তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লয়, ইহার মূল্য কিন্তু বড় বেশী। সচরাচর তিল তৈলে ফুলের আতর মিশাইয়া ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়।

সিন্ধু দেশে তিলের খৈল কে ঘাড়বলে।

এই খৈল গো-মেষ-মহিষাদির পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। তৈলের খৈলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে অনেক গরীব লোক আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলের খৈল ভক্ষণ করিয়া থাকে।

তিলের কল্ক অত্যন্ত বলকারক এবং স্তন্য বর্দ্ধক। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়—এই জন্য অর্শরোগীর পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। তিল আমাশয় রোগীর পক্ষেও মহৌষধ। পঞ্জাবের চিকিৎসকগণ বাত রোগে এবং স্ফোটকে তিল তৈল ব্যবহার করেন। তিল তৈল বিরেচক গুণ বিশিষ্ট। ইহার মালিসে ত্বক্ কোমল হয়, গায়ের জ্বালা কমে, স্বেদ জনিত দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, শরীর বেশ স্নিগ্ধ হয়।

বড় গামলার এক গামলা গরম জলে, আধপোয়া তিল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলে কটি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিলে, স্ত্রীলোকের বাধক-যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। তিলের কাথ চিনি সহ সেবনে সর্দ্দি ভাল হয়। মীরাটবাসীরা চক্ষুরোগে তিল ফুলের শিশির প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

তিলের পাতার এক রকম চট্‌চটে পদার্থ থাকে। এই চট্‌চটে জিনিষ যুক্ত-প্রদেশে কলেরা ও আমাশয়ের ঔষধ। পাতা জলে ভিজাইয়া রগ্‌ড়াইলে চট্‌চটে জিনিষ জলে মিশ্রিত হয়, সেই জল পান করিতে হয়।

তিল পত্রের কাথ কেশ-বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম-এ।

গোল-আলুর গর্ব্ব।

[কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত]।

ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ হ'তে।
উড়ে এসে জুড়ে আমি ব'সেছি ভারতে॥
'পটাটস্' নাম ছিল সাহেবের দেশে।
'গোল-আলু' নাম হ'ল বাঙ্গালায় এসে॥
আনাজের রাজা আমি, মণ্ডল আকার।
ভোগীর ভোগের নিধি, সুখের আহার॥
স্বভাবতঃ নপুংসক, নাহি মোর বীজ।
নিজ রক্তে জন্ম লই যেন "রক্ত-বীজ"॥
শোধিতে প্রেমের ধার মানিনী রাধার।
আলু-রূপে কলিতে গৌরাঙ্গ অবতার॥
শিশিরে উদ্ভব মোর কৃষির কৃপাতে।
পিরীতে প'ড়েছি ধরা, রাখালের হাতে॥
সত্বগুণ সুপ্রকাশ বিষ্ণু অংশ ব'লে।
প্রেম-ভরে আ-চণ্ডালে তুলে লই কোলে॥
কিবা হিন্দু, কিবা ম্লেচ্ছ, যত জাতি আছে।
আলুর আদর দেখ, সকলের কাছে॥
'আরিস্' * গণের আমি প্রধান সম্বল।
অন্নের সমান গুণ ধরি অবিকল॥

* আইরিস্।

মাংস রুটী কোথা পা'বে দীন হীন যা'রা।
পেট ভ'রে আলু খেয়ে বেঁচে থাকে তা'রা।
আমারে 'বয়েল' ক'রে বিফ্ রোষ্ট দিয়া।
ছেলে বুড়া আদি সবে খায় চিবাইয়া॥
বাঙ্গালীর মত কেউ রাঁধিতে নাহি জানে।
মৌলিক মৌরসী তাই আমার এখানে॥
আনাড়ী 'কুকের' হাতে মস্‌লা না মিলে।
'হাজিরার' কালে, করে হাজির টেবিলে॥
অঙ্গ করে আলিঙ্গন রসবতী রাই †।
আধসিদ্ধ হ'য়ে তবু সুখ কিছু পাই॥
ব'সে হোটেলের 'সপে' সঙ্গে ল'য়ে মিস্।
মুখে দেয় বুকে কাঁটা, মুখে কিন্তু পিস্॥
নিজে ব্যথা পেয়ে, তুষি অপরের মন।
মহৎ কে আছে বল আমার মতন॥
যাতে দাও তা'তে আছি, রুটী লুচী ভাতে।
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্যঞ্জন মজা'তে॥
ঝোলে-ঝালে-অম্বলেতে করি বিচরণ॥
চচ্চড়ীতে শুষ্ক তনু 'সুতার' কেমন॥
আলু-ভাতে মেখে কেহ কাঁচা লঙ্কা দিয়া।
ছ' রেক ‡ চালের অন্ন দেয় উড়াইয়া।
চাকা চাকা ক'রে যদি ছাঁকা তেলে ভাজে।
জিলাপী পলায় দূরে হেরে মোরে লাজে॥
কৃপণ-গৃহিণীগণ যে গৃহে বিরাজে।
সিদ্ধ ক'রে অল্প তেল দিয়ে তারা ভাজে॥
কাজেই সোণার অঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে যায়।
নিজ দোষে, পোড়া-মুখে, পোড়া আলু খায়॥

উড়েনীর মত গায়ে হলুদ মাখিয়া।
মদের দোকান পাশে ব'সে থাকি গিয়া॥
"আলু দম" বলে তা'রে রসিক সুজন।
মুখে দিলে খুসী বড় মাতালের মন॥
কচুরীর সঙ্গে প্রেম খোট্টার দোকানে।
বৃথা জন্ম তা'র, তা'র 'তার' যে না জানে॥
সুবর্ণ বণিকগণ নহে মাংসাহারী।
আমিই তা'দের ঘরে শ্রেষ্ঠ তরকারি॥
বর্ষাকালে ভর্সা আমি—অধম-তারণ॥
অনেকেরই হয় তাই জীবন ধারণ॥
পরম গোঁসাই যিনি পাঁঠা নাহি খান।
অজা-রসে ভিজা আলু খেয়ে মজা পান।
সধবা—বিধবা ভেদ নাহি রাখি মনে।
সমভাবে সদালাপ সকলেরই সনে॥
প্যাজ্ দিয়া রাঁধে মোরে প্রেমিক-যবনে।
গোপনে সে রসে মজি হিন্দুর ভবনে॥
কোন স্থান পুড়ে গেলে, আলু বেটে দিবে।
ফোস্কা কভু হবেনাক, জ্বালা জুড়াইবে॥
শুচি-বেয়ে-মাগী গুলা জল ঘেঁটে মরে।
হাত পা'র আঙ্গুলে তা'দের হাজা ধরে।
আলু পোড়া সে রোগের পরম ঔষধি॥
দু'বেলা প্রলেপ তা'র দিতে পার যদি॥
যে ভজে আমায় তা'র বুদ্ধি হয় বল।
মহিমা না জানে শুধু পেট-রোগা দল॥
বহুমূত্র রোগী যা'রা—অতি অভাজন।
আমারে ডরায় তা'রা যমের মতন॥

† ষ্টার্চ। ‡ কাঠা বা পালি।

বৈদ্য-বৃত্তি।

—*—

অনেক দিন ধরিয়া, প্রায় সমস্ত সভ্য-জগতে,—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে; আমাদের এই বঙ্গদেশকেই উক্ত বিকাশের কেন্দ্রস্থল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ হয় না। যতদূর অনুধাবন করিতে পারা যায়, তাহাতে আমার মনে হয়, মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে তাহার ক্রমোন্নতি সহ অশেষ কল্যাণময় সনাতন চিরারাধ্য আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতন আরম্ভ, হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় বিলোপ-দশায় উপনীত হয়। তৎকালে, যেরূপ দ্রুতগতিতে ইহার অবনতি হইতেছিল, দেশের তাদৃশ অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে, এতদিনে ইহার অস্তিত্ব থাকিত কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইত।

'আয়ুর্ব্বেদ' শত সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ করিয়াও, এখন আত্মনির্ভরক্ষম এবং প্রায় সার্ব্বজনীন সত্য স্বরূপে প্রতীত হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ আদি বিজ্ঞানময় রাজ্যের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদকে একটী দর্শন ও আলোচনার বিষয় মনে করিয়া, ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

ইহাতে আমাদেরই সমধিক গৌরব। যে হেতু "আয়ুর্ব্বেদ" আমাদেরই পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত সম্পত্তি, রক্ষণাবেক্ষণের দোষে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিল, কিন্তু অনুকূল-কাল-প্রবাহে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হওয়া আমাদেরই পক্ষে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। অগাধ আয়ুর্ব্বেদ-সিন্ধু বর্ত্তমানে যেভাবে মন্থন করা হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে সাফল্য-রত্নের আশা করা যায় কি না,—সম্প্রতি এতদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা ও তদনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। সেইজন্য আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নিজ নিজ স্বার্থ-সাধন জন্য এসময়ে এই জাতীয় মহা গৌরবের প্রতিকূলে যাহাতে আমরা আমাদের শক্তির লেশমাত্রও অপব্যবহার না করি, তৎপ্রতি বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অনেক সময় অনেকে নিজের দোষ নিজে দেখিতে পায় না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং কোনও সৎপ্রদর্শক যদি তাহা দেখাইয়া দেন, তাহাতে তৎপ্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমরা ভ্রম বা অনবধানতা বশতঃ অথবা স্বার্থপরতা-মোহে মুগ্ধ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মর্য্যাদা যথেষ্ট লঙ্ঘন করিতেছি, কেহ জ্ঞানের অভাবে, কেহ কর্ম্মাভ্যাস অভাবে, কেহ উক্ত উভয়বিধ অভাবে, কেহ বা লোভের বশবর্ত্তিতায়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে এমত বিকৃতাবস্থায় পরিণত করিতেছে যে, তাহা চিন্তা করিলে কোন হৃদয়বান্ই স্থির থাকিতে পারেন না। আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া, স্বেচ্ছাচার-কুঠারাঘাতে, আয়ুর্ব্বেদকেই ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। এই প্রকার যথেচ্ছাচারী হিতাহিত-বোধ-বর্জ্জিত-কুবৈদ্যগণ যেরূপ অপ্রতিহত গতিতে আয়ুর্ব্বেদকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে, জানি না, কোন্ অপার্থিবশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার কোন্ মহাপ্রভাববলে ইহা উদ্ধার পাইতে

সমর্থ হইবে। আয়ুর্ব্বেদ কি? তদ্বিধিবিহিত কর্ত্তব্যই বা কি? বৈদ্য কাহাকে বলে? বৈদ্যের বিধেয় ও দায়িত্ব কি? অধিকাংশ কবিরাজই ইহার খবর রাখেন না। অথবা এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে কোনরূপ কার্য্যেরও অসুবিধা মনে করেন না, ইহা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে? যে শাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই, বৈদ্যকে স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধন বিষয়ে ভূয়ো ভূয়োঃ সতর্ক করিয়া দিতেছে, গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া বৈদ্য অপথে স্খলিত পদ না হন, সেইজন্য পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতেছে, আমরা কিন্তু সেই জগদারাধ্য, দেবতুল্য ঋষিদের সংশিক্ষা ও অনুশাসন বাক্য অসংকোচে লঙ্ঘন করিয়া, অশাস্ত্রীয় যথেচ্ছাচার-বিহিত কুপথে বিচরণ করতঃ মানব জীবনকে একটা অকিঞ্চিৎকর ক্রীড়া-পুত্তলিকা মনে করিয়া, উহার ভবের খেলা সাঙ্গ করাইয়া দিতেছি,—ইহাপেক্ষা দেশের অধোগতি আর কি হইতে পারে?

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্‌গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥

অর্থাৎ—আচার্য্যের মুখ হইতে উপদিষ্ট শাস্ত্র যথার্থ ভাবে গ্রহণ করতঃ পুনঃ পুনঃ তদনুষ্ঠিত বিধির অনুশীলন করিবে এবং পরিণামে তদ্বিষয়ে অন্তঃকরণ সংশয় বর্জ্জিত হইলে, বৈদ্য চিকিৎসা-ব্যাপারে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, উল্লিখিত বিধির বহির্ভূত বৈদ্য, কেবল বৈদ্যনামের অযোগ্য নহে, পরন্তু শাস্ত্রকার তাহাকে তস্কর নামে অভিহিত করিয়াছেন। শাস্ত্রকার যদিও এতাদৃশ বৈদ্যকে তস্কর মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তব পক্ষে উক্ত ব্যক্তি সামান্য তস্কর নহে। সাধারণতঃ তস্কর মানবের পার্থিব সম্পত্তি মাত্রই অপহরণ করে, কিন্তু ঈদৃশ তস্কর-বৃত্তি-বৈদ্য অর্থসহ অমূল্য জীবন রত্নের অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কি ভয়ানক হিংস্র তস্কর! বাস্তবিক বৈদ্যবৃত্তি সহজ সাধ্য নয়। কেবল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নকারী চিকিৎসক নিজবৃত্তি পরিশীলনে অধিকার লাভ করিতে পারেনা। আয়ুর্ব্বেদে সম্যক অধিকার অর্জন করিতে হইলে, ব্যাকরণ, সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্রে ও ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। নতুবা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অধিকার জন্মিতেই পারে না। চরকাদি বৈদ্যকসংহিতার ভাষা সরল নহে; শব্দশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ব্যতীত কেহই উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি দর্শন-শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ অলঙ্ঘনীয়। ফলতঃ দর্শন-শাস্ত্রকে আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নিমিত্তই সুশ্রুত সংহিতাকার বলিয়াছেন—

একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ং।
তস্মাদ্ বহুশ্রুতঃশাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ॥

অর্থাৎ—কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। প্রয়োজনানুসারে ব্যাকরণ-দর্শনাদি অপরাপর যে যে শাস্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, সেই সেই শাস্ত্রেও বুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। অতএব বহু শাস্ত্রার্থ বেত্তা ব্যক্তিই প্রকৃত চিকিৎসক হইতে সমর্থ। ইহাই যথেষ্ট নহে, বৈদ্যকে প্রতি পদ-বিন্যাসে সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত ও সাধারণ জনগণকে বৈদ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে

অভিজ্ঞান-প্রদানের জন্য বৈদ্যক-শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ আছে।

সুশ্রুত সংহিতা—সূত্রস্থান—৩য় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

যে বৈদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, কিন্তু চিকিৎসা কর্ম্মে (ঔষধাদির উপযুক্ত বিধানানুসারে প্রস্তুত করণে ও স্বর্ণাদি ধাতু বা উপধাতু সমূহের জারণ, মারণ, শোধনার্থ কর্ম্মে এবং তৈল, ঘৃত, মোদক, গুড়, আসব, অরিষ্ট, চূর্ণ ও বটিকাদির যথা নিয়মে প্রস্তুত ও প্রয়োগ বিধানে) অবহেলা করতঃ অনভ্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ বৈদ্য কদাপি চিকিৎসক নামের যোগ্য নহে।

যুদ্ধ-নীতি-বিশারদ—অথচ কোন দিন স্বয়ং রণস্থল দর্শন করেন নাই—এরূপ ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ভয়াবহ ব্যাপার-সন্দর্শনে যেমন ভয়াবিষ্ট ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়, চিকিৎসা-কর্ম্মে অনভ্যস্ত কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যরও রোগি-সমীপে তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে যে বৈদ্য যথারীতি চিকিৎসা কর্ম্মে অভ্যস্ত, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান পরাঙ্মুখ,—তাহারও চিকিৎসাকার্য্যে অধিকার নাই। আর্য্যযুগে, উক্ত উভয়বিধ বৈদ্যই রাজ-শাসনে, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত। ইহাদিগকে অর্দ্ধ শিক্ষিত ও এক পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায়, অকর্ম্মণ্য বলিয়া শাস্ত্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। অমৃতোপম জীবনপ্রদ ঔষধও কালান্তক যম-সদৃশ মূর্খবৈদ্য প্রযুক্ত হইয়া, বজ্র ও বিষবৎ, মানবের প্রাণ বিনাশের হেতু হয়। অতএব এতাদৃশ বৈদ্য দ্বারা কদাপি চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য নহে।

স্নেহাদি-কর্ম্মে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত স্নেহন, স্বেদন, বমন, বিরেচন ও অনুবাসনাদির প্রয়োগ বিষয়ে অপারদর্শী অথবা তৈল-ঘৃতাদির পাক কর্ম্মে অনিপুণ, ও শস্ত্রাবচরণে অনভিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে, উহা তদ্দেশীয় রাজারই অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত। কারণ রাজার অনবধানতা দোষেই তাদৃশ অনধিকারী বৈদ্য রাষ্ট্রমণ্ডলে রাজবিধি বহির্ভূত হইয়াও অনধিকার চর্চ্চার অধিকারী হইতে সমর্থ হইত।

বৈদ্যের দায়িত্বের গৌরব বিষয়ে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"মাতরং পিতরং পুত্রান্ বান্ধবানপিচাতুরঃ।
অপ্যেতান্ পরিশঙ্কেত বৈদ্যে বিশ্বাসমেতি চ॥"

মনুষ্য, ব্যাধিক্লিষ্ট হইলে, যন্ত্রণার লাঘব-বিষয়ে মাতা, পিতা, পুত্র ও বান্ধবদিগের প্রতিও বিশ্বস্ত হৃদয়ে নির্ভর করিতে শঙ্কিত হয়। শরীর-তত্ত্বাভিজ্ঞতা এবং রোগাপনয়ন-শক্তি-ব্যতীত কেবল স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, বাৎসল্য বা আত্মীয়তা-প্রদর্শনে রোগার্ত্তের যাতনা নাশের সম্ভাবনা নাই। ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিয়াই রোগী নিঃসন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে, বৈদ্যের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। অনেক স্থলে এই রূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস বশতঃ অভীষ্ট-চিকিৎসকের দর্শন-স্পর্শনেও রোগী রোগ-যন্ত্রণার উপশম বোধ করে। . . .

এখন একবার চিন্তা করুন, পাঠক! বৈদ্যের দায়িত্ব কি? বৈদ্যের বৈদ্যত্ব কোথায়? যাঁহার নাম শ্রবণে, রোগপীড়িত ব্যক্তি পুলকিত হয়, যাঁহার দর্শনমাত্রে ব্যাধি-যাতনার উপশম অনুভূত হয়, তাদৃশ বৈদ্যের মহত্ব ও পারদর্শিতার পরিমাণ একবার স্মরণ করিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের আলোচনা করুন,—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

এতৎ প্রসঙ্গে বৈদ্যকশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় চরক-সংহিতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ২।১টী কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলামনা। চরকসংহিতাকার বলিতেছেন,—

"দেশ কালানুসারে ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক যিনি ঔষধ প্রয়োগে সমর্থ,—তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। পাত্রাপাত্র অথবা প্রয়োজ্য ঔষধের গুণাদির পরিচয় না জানিয়া, ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, উহা শস্ত্র, বিষ, অগ্নি ও বজ্রের ন্যায় রোগীর প্রাণ-নাশক হয়; অথচ সুবিজ্ঞাত হইয়া, ব্যাধি ও প্রকৃতির অনুকূলে ব্যবহৃত হইলে, পীড়ানাশক, জীবনবর্দ্ধক অমৃতরূপে পরিণত হয়। নাম, রূপ বা গুণাদির দ্বারা অজ্ঞাত, কিম্বা বিজ্ঞাত হইয়াও অযথাবস্থায় দুষ্প্রযুক্ত ঔষধ কোন উপকার সম্পাদন করেনা, প্রত্যুত উহা অনর্থেরই কারণভূত হয়। সুতীব্র-সর্পাদির বিষও প্রয়োগনৈপুণ্যে রোগহারী উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হয়, আবার সুধোপম ভৈষজ্যও অযথা-প্রয়োগে বিষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করে। অতএব প্রয়োগ-জ্ঞানহীন-মূর্খ বৈদ্য প্রযুক্ত ঔষধ প্রাণান্তেও সেবন করা বিধেয় নয়। দীর্ঘজীবন ও সুস্থতাভিলাষী, বিশেষ পরীক্ষিত বৈদ্যকেই চিকিৎসা কর্ম্মে বরণ করিবেন। ইন্দ্রের বজ্র মস্তকে পতিত হইলেও কদাচিৎ কেহ ত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ কুবৈদ্য-চিকিৎসা-ক্রান্ত ব্যক্তি কখনই জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার আশা করিতে পারেনা। ব্যাধি-যন্ত্রণাক্লিষ্ট-অকর্ম্মণ্য দশায় শয্যাশায়ী, বিশ্বস্ত-হৃদয় রোগীর প্রতি, যে যথেচ্ছাচারী, মূঢ় বৈদ্য প্রাজ্ঞাভিমানী হইয়া নিজের অপরিজ্ঞাত ঔষধ প্রয়োগ করে, ধর্ম্মহীন, দুরাচার সংসারের মৃত্যুরূপধারী তাদৃশ বৈদ্যের সহিত সম্ভাষণ করিলেও নিরয়গামী হইতে হয়। যথার্থ চিকিৎসক পদলাভেচ্ছু বৈদ্য উক্ত দোষ সমূহ পরিহারকরতঃ, বৈদ্যবিহিত গুণ সম্পন্ন হইবেন, যাহাতে মানবগণ জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই একমাত্র তাঁহার জীবনব্রত। এই পবিত্র ব্রতপরায়ণতা গুণে তিনি ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অধিকারী হয়েন। ফলতঃ যাহা হইতে ব্যাধির যাতনা প্রকৃতরূপে উপশমিত হয়, তাহাই যথার্থ ঔষধ, আর যিনি তাদৃশ ঔষধ-প্রয়োগে রোগীগণকে রোগ যাতনা হইতে মুক্তিদান করেন,—তিনিই যথার্থ বৈদ্য।"

কবিরাজ শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত
কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, চরক মতে সংপ্রাপ্তি ও সামান্য লক্ষণে সর্ব্বত্রই বেদনার প্রাধান্য বরং বাতলিঙ্গের মধ্যে বিশেষতঃ ও অতিরুক্‌ শব্দে "অতি" এই বিশেষণ সন্নিবেশানুসারে অন্ততঃ বাতরক্তের বাতলিঙ্গে সুপ্তি লক্ষণ চরকের অনুমত নহে—ইহা অনায়াসেই বলা যায়। বিশেষতঃ চরকোক্ত কুষ্ঠের ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ—"বিশেষতঃ" স্পর্শনয়াণাম্—এই বাক্যের সহিত বিরোধ-ভঞ্জন এবং "বিশেষতঃ" এই বিশেষণের সার্থকতা ও গৌরব রক্ষা করিতে হইলে বলিতেই হইবে, বাতরক্তের সুপ্তি লক্ষণটী সাময়িক * এবং ঈষন্মাত্র হইয়া থাকে। চরকোক্ত কফ লক্ষণে যে সুপ্তির কথা আছে, সে সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা অপরিহার্য্য। "সুপ্তির্মন্দা চ রুক্"—এই বচন সন্নিবেশ-প্রণালীতেও তাহাই প্রতীত হয়। মন্দা এই বিশেষণটীর সুপ্তি ও রুক্ এই দুইটী বিশেষ্য বা লক্ষণের মধ্যবর্ত্তিত্ব এবং 'মন্দা' এই বিশেষণের পরই সমুচ্চয় সূচক চকার নিবেশ দ্বারা "মন্দা সুপ্তির্মন্দা চ রুক্" এই অর্থই প্রতিপাদিত হয়। মন্দা শব্দটী কেবল রুক্‌এর বিশেষণ—চরকের এরূপ অভিপ্রায় থাকিলে 'সুপ্তিশ্চ মন্দরুক্ কফে' এইরূপ বচন সন্নিবেশ হইত। বাগ্‌ভট বোধ হয় এই তর্ক পরিহারের জন্য কফ লক্ষণে "সুপ্তিস্নিগ্ধত্বশীততাঃ কণ্ডূর্মন্দা চ রুক্" এই পাঠ রচনা করিয়াছেন। নিদানকার মাধবকর ও বাগ্‌ভট-বচনই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর্ষমতদ্বৈধ বিচারে সংগ্রহকারের মত বিচার অনাবশ্যক, কেননা সংগহকারের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই।

বাতরক্তের দ্বিতীয় ভেদক লক্ষণ—ইহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সন্ধিসমূহকে আক্রমণ করে।

তস্য স্থানং করৌ পাদাবঙ্গুল্যঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ।

বাতরক্তের আক্রমণ স্থান হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, অঙ্গুলীসমূহ ও সমস্ত সন্ধিস্থল।

তদ্ দ্রবত্বাৎ সরত্বাচ্চ দেহং গচ্ছেৎ শিরায়নৈঃ পর্ব্বস্বভিহতং ক্রুদ্ধং বক্রত্বাদবতিষ্ঠতে—

রক্তের দ্রবত্ব ও প্রবহন-শীলতাবশতঃ সেই বাতরক্ত শিরাপথে গমন করিয়া পর্ব্ব স্থানের বক্রত্বহেতু রুদ্ধ ও দূষিত হইয়া অবস্থান করে। "করোতি দুঃখং তেষ্বেব তস্মাৎ প্রায়েণ সন্ধিষু"

সেই কারণে প্রায়ই সেই সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করে।

ধমন্যঙ্গুলীসন্ধীনাং সঙ্কোচঃ .....

ধমনী অঙ্গুলী ও সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ হয়। রক্তমার্গং নিহন্ত্যাশু শাখাসন্ধিষু মারুতঃ নিবেশ্য......

হস্ত-পদাদির সন্ধিস্থানে বায়ু অবস্থান করিয়া রক্তের পথ রুদ্ধ করে।

[চরক বাতশোথ চিঃ অঃ]

এবং বাতরক্তের পূর্ব্বরূপে—

সন্ধি শৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্গমঃ

সন্ধিস্থানের শিথিলতা, অলসতা, অবসাদ পিড়কা প্রাদুর্ভাব হয়।

---

* অর্থাৎ, বাতরক্তে পরবয় স্পর্শাসহ হয় এবং সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা, বিদীর্ণবৎ বেদনা, গুরুতা ও সুপ্তিযুক্ত হয়।

জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু
নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদঃ......

জানু জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও শরীরের সন্ধিসমূহে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়।

তৃতীয় ভেদক লক্ষণ :—

কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্‌ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চা সকৃৎ
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্ পূর্ব্বলক্ষণম্
[চরক বাতশোথ চিকিঃ অধ্যায়]

এই শেষোক্ত বচনটীর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা এই—চুলকানি হয়, সন্ধিস্থান সমূহে পুনঃ পুনঃ বেদনা হইয়া প্রশমিত হয় এবং বিবর্ণতা ও মণ্ডলোৎপত্তি হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগের পূর্ব্বরূপের মধ্যে "স্বল্পানামপি ব্রণানাং দুষ্টিরসংরোহণঞ্চেতি" অর্থাৎ অতি সামান্য ব্রণেরও দুষ্টি এবং অশুষ্কতা (চরঃ কুষ্ঠনিঃ) এই লক্ষণ আছে। বস্তুতঃ কুষ্ঠরোগের মণ্ডল বা ব্রণ একবার উৎপন্ন হইলে আর শীঘ্র সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না—ইহা কুষ্ঠরোগের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। সুশ্রুত কুষ্ঠ পূর্ব্বরূপে বলিয়াছেন,—"যত্র যত্র চ দোষো বিক্ষিপ্তো নিঃসরতি তত্র তত্র মণ্ডলানি প্রাদুর্ভবন্তি এবমুৎপন্ন স্বচি দোষস্তত্র চ পরিবৃদ্ধিং প্রাপ্য অপ্রতিক্রিয়মাণোঽভ্যন্তরং প্রপিপদ্যতে ধাতূন্ দূষয়ন্" (কুষ্ঠনিঃ) অর্থাৎ যে সমস্ত স্থানে দোষ প্রসৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হয় সেই সমস্ত স্থানে মণ্ডলসমূহ উদ্ভূত হয় এবং এই ভাবে ত্বকে দোষ উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং প্রতীকার করিতে না পারিলে দেহের ধাতুসমূহ দূষিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাই চরক বলিয়াছেন 'কুষ্ঠং দীর্ঘরোগানাম্' (চরক সূত্রং যজ্জঃ পুরুষাধ্যায়) দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগনিচয়ের মধ্যে কুষ্ঠ সর্ব্ব প্রধান। কুষ্ঠের সহিত বাতরক্তের পার্থক্য রাখিতে হইলে ঐ বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। "কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুক্ বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তিশ্চ অসকৃৎ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি অর্থাৎ এই সমুদয় লক্ষণই বারংবার প্রকাশিত হয় ও নিবর্ত্তিত হয়। এই ব্যাখ্যায় 'নশ্যতি' এই শব্দের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণাবলী এবং পরবর্ত্তী দুই লক্ষণের মধ্যে সমুচ্চয়সূচক 'চ'কার সন্নিবেশের সার্থকতা লক্ষিত হয়, গরুড়পুরাণের বচনের সহিতও এক বাক্যতা রক্ষিত হয় * সুতরাং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ ও উপশম এই পূর্ব্বরূপটি ও বাতরক্তের বিশিষ্ট ভেদক লক্ষণ।

এক্ষণে আমরা কুষ্ঠ ও বাতরক্তের পরস্পর ভেদ-নিদর্শক লক্ষণসূচীবিন্যাস করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কুষ্ঠ।

১। স্পর্শ শক্তির অভাব হয়।

২। একবার আরম্ভ হইলে শীঘ্র (প্রতিকার না করিলে) উপশমিত হয় না।

৩। ত্বক্-সঙ্কোচ, করভঙ্গ ও অঙ্গুলি পতন হয়।

৪। নাসা, কর্ণ, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গের পতন হয়।

৫। আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। মুখমণ্ডলে অনেক সময় দেখা যায়।

বাতরক্ত।

১। অত্যন্ত বেদনা হয়।

২। পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত ও উপশমিত হয়।

* গরুড়পুরাণম্ পূর্ব্বখণ্ডম্ ১৭১ অধ্যায়ঃ।

৩। ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের বক্রতা ও সঙ্কোচ হয়।

৪। অঙ্গপতন কখন হয় না।

৫। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয়। হস্ত পদ ও অঙ্গুলি বিশিষ্ট অধিষ্ঠান। বাতরক্ত কখনও মুখে হয় না।

কুষ্ঠ।

৬। অক্ষিরোগ (চক্ষুর লৌহিত্য) হইয়া থাকে।

৭। আক্রান্ত স্থলে স্বেদ হয় না (কচিৎ হয়)

৮। আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

৯। ক্রিমি জন্মে।

বাতরক্ত।

৬। অক্ষিরোগ হয় না।

৭। স্বেদ হইয়া থাকে।

৮। পাদমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হয়।

৯। ক্রিমি দৃষ্ট হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন "পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে আয়ুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা অতি অন্যায়। এরূপ বিজাতীয় সংমিশ্রণ সঙ্গত নহে। ঋষিবাক্য ও কি শেষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কষ্টিপ্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে?" তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই, আমি আর্ষ বাক্য অপেক্ষা প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমূহ বলবত্তর প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না। কিন্তু মূল আর্ষ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়, যাঁহা আছে,—তাহাও সর্ব্বত্র সহজ-বোধ্য নহে এবং তজ্জন্য চক্রপাণি, ডল্লণ, বিজয়রক্ষিত, অরুণদত্ত, শ্রীকণ্ঠ এবং বাগ্‌ভট, মাধব ও ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র প্রভৃতি টীকাকার ও সংগ্রহকার-গণের শরণাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু টীকাকার ও সংগ্রহকারগণও সর্ব্বত্র বিশদ মীমাংসা ও ব্যাখ্যা করেন নাই, অনেক স্থানে "দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ" দুর্ব্বোধ স্থলসমূহ স্পষ্টার্থ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। আর্ষমত দ্বৈধক্ষেত্রে "স্মৃতিদ্বৈধবৎ সর্ব্বং প্রমাণং" বলিয়া (অর্থাৎ দুই স্মৃতিকারের ভেদ হইলে উভয়েরই মতের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদে আর্ষ মত দ্বৈধ স্থলে উভয় ঋষির মতই প্রমাণ অর্থাৎ গ্রাহ্য) তর্ক পরিহার করিয়াছেন *। আমি সেস্থলে প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে আয়ুর্ব্বেদের অভিনব টীকাস্বরূপ ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি,

* অথচ প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রের মীমাংসকগণ প্রায়ই একের প্রাধান্য অন্যের গৌণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতার প্রাধান্য দেখাইবার জন্য কুল্লুক ভট্ট বৃহস্পতি প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হিমনোঃ স্মৃতমন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ইত্যাদি। অন্যদিকে বঙ্গীয় স্মার্থপ্রধান রঘুনন্দন এক স্মৃতির অনুরোধে অন্য স্মৃতির সঙ্কোচ ও অর্থবাদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, মনু বচনও তিনি অর্থবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। কেবল আয়ুর্ব্বেদেই সেই তর্ক ও মীমাংসা স্থাপনের চেষ্টা বিশেষ লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ আর্ষত্বেরও ইতর বিশেষ আছে। সকলেই তুল্য বল প্রমাণ নহেন, নচেৎ ভগবান্ পুনর্ব্বসু বিবদমান ঋষিগণের মধ্যস্থতা বা মীমাংসকের পদলাভ করিতে পারিতেন না। চরকপাঠীর তাহা অজ্ঞাত নহে। মহর্ষি আত্রেয়ের ষট্‌শিষ্য-ঋষিগণের মধ্যে "বুদ্ধেবিশেষে স্তত্রাসীৎ" বলিয়া মহর্ষি অগ্নিবেশের প্রশংসা বচনও এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের শারীরিকভাষ্যে এইরূপ বিচার প্রণালীতেই সাংখ্য ও পাতঞ্জলাদির মত খণ্ডন করিয়াছেন। সে সকল কথা বলিবার স্থান ও সময় এখন নাই।

এবং তাহা করা অসঙ্গত ও মনে করি না। “গ্রন্থস্থ গ্রন্থান্তরং টীকা”—ইহা আমাদেরই শাস্ত্রের কথা। চক্রপাণি, ডল্লন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, অরুণদত্ত, এবং বাগ্ভট, মাধবকর, ভাবমিশ্র প্রভৃতির তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রকারগণকে সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট বিবেচনা করার কোন কারণ নাই। আর একটী কথা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে, পারলৌকিক পরোক্ষফলক ও ধর্ম্ম বিষয়ক শাস্ত্র এবং ইহলৌকিক প্রত্যক্ষফলক শাস্ত্রের বিচার ও অনুশীলনের প্রণালী একরূপ হইতে পারে না—যে শাস্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষফলক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে তাহা যদি স্থানে স্থানেও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত কর, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রের তৎ তৎ স্থলের সংস্কার আবশ্যক; নচেৎ প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা লুপ্ত হইবে। শাস্ত্র বাক্য অর্থাৎ ঋষি প্রভাব শাসিত এই ভারতবর্ষেও তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধিক দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই,—এই আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসেই দেখা যায় যে, ভেল, জতুকর্ণ, ক্ষারপাণি এবং ঔপধেনব প্রভৃতি কৃত এমন কি মূল অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত কৃত তন্ত্র বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়। প্রতি সংস্কৃত চরক ও সুশ্রুতসংহিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। শাকল্য-সংহিতার এই বচনটী মণীষিগণের অনুকরণ যোগ্য।

কিং তেনাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যৎ
তথাকিং তেন শাস্ত্রেণ যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটম্?

যাহাতে কেবল কর্ণ পীড়া উৎপন্ন হয় এমন কুণ্ডলে কি প্রয়োজন? যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, সে শাস্ত্রে কি লাভ হয়?

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই যে যথার্থ বা প্রামাণিক, আমি এমন স্পর্দ্ধা বা দাবী রাখি না। কিন্তু আপনাদের মত আয়ুর্ব্বেদ প্রবীন সুধীগণের সম্মুখে আমার এই সামান্য প্রবন্ধ পাঠের অধিকার-গৌরব যখন লাভ করিয়াছি, তখন আপনাদের নিকট এ বিষয়ের সমালোচনা ও বিচারের দাবী করিয়া এবং এই বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত স্থাপন—অন্ততঃ রীতিমত আলোচনার সূত্রপাত করিয়া আপনারা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই সামান্য প্রবন্ধের ও সার্থকতা সম্পাদন করিবেন—এমন স্পর্দ্ধাও করিব এবং আপনাদের উপর এই দাবী ও এই স্পর্দ্ধা করিবার অধিকারে বঞ্চিত হইব না—এই আশা লইয়া অদ্য এই স্থানেই অবসর গ্রহণ করিতেছি। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
কাব্যতীর্থ কবিরত্ন।

---

* ভ্রম সংশোধন।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে দুইটী গুরুতর মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। (১) ৩৯৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের চতুর্থ এবং পঞ্চম পংক্তিতে “...প্রমাণ প্রত্যক্ষ ...” এইরূপ বিপর্য্যস্তভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে “প্রত্যক্ষ প্রমাণ” হইবে। (২) ঐ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে উদ্ধৃত ন্যায়সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যের “ইত্যাপ্তঃ” (টিপ্পনীর ষষ্ঠ পংক্তি) এই অংশের পর “ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্” এই কথাগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য আমি পাঠকগণের নিকট লজ্জিত আছি।

—লেখক

মাধবের পঞ্চনিদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য।

—:*:—

মাধবকৃত রুগ্বিনিশ্চয় গ্রন্থের যে অংশ সাধারণের নিকট পঞ্চ নিদান নামে সুপরিচিত, তাহা মহামতি বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের নিদান স্থানের প্রথম অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। কেবল মঙ্গলাচরণ ছাড়া অবশিষ্ট শ্লোক গুলি মাধব অবিকল যেমন বাগ্‌ভট হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাগ্‌ভট তেমনি চরক সংহিতাকে মূল করিয়া চরকের গদ্যাংশ পদ্যে—শ্লোকাকারে অনুবাদ করিয়াছেন। চরকসংহিতায় এই অংশের কোন বিশেষ নাম নাই;—বাগ্‌ভট কিন্তু ইহার নামকরণ করিয়াছেন—"সর্ব্বরোগনিদানম্"। জানি না মূল গ্রন্থে—"সর্ব্বরোগ নিদান" এই শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও মাধবনিদানে কেন ইহা পঞ্চ নিদান" নামে সমাখ্যাত? যদিও আত্রেয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিজ্ঞানের উপায় সংখ্যায় পাঁচটি মাত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের মতে, কেবল পাঁচটিই যে রোগ বিজ্ঞানের উপায়, তাহা নহে—আত্রেয়াদি মুনিগণের মতে—

নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয় স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং
পঞ্চধাস্মৃতম্॥

কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায় বলেন—

সঞ্চয়ঞ্চ প্রকোপঞ্চ প্রসরং স্থানসংশ্রয়ম্।
ব্যক্তি ভেদঞ্চ যো বেত্তি রোগাণাং
সভবেদ্ভিষক্॥

অর্থাৎ, নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি—যেমন একদিকে রোগ-বিজ্ঞানের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে আমরা দেখিতে পাই—

সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থানসংশ্রয়, ব্যক্তি ভেদ—এই ছয়টিও রোগ বিজ্ঞানের উপায়। সুশ্রুত সংহিতায় ব্রণ প্রশ্নাধ্যায়ে এই শ্লোকটি পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত শল্যতন্ত্র, সুতরাং ব্রণের বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্যবস্তু; সেইজন্য ভেদ শব্দ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রণের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থান সংশ্রয়, ব্যক্তি ভেদ—ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও আমরা যখন এই ব্রণ প্রশ্নাধ্যায় মনোযোগের সহিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই, ব্রণ বিজ্ঞান ইহার লক্ষ্য হইলেও সর্ব্বরোগ নিদানই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, আত্রেয় সম্প্রদায়ের রোগ-বিজ্ঞানের তালিকা এবং ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের তালিকা সংখ্যায় এক নহে। সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর ইহাতে অতিরিক্ত। প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে যাহাকে Pathogenesis বলে—সঞ্চয় প্রকোপ প্রসর তাহাই—Generation and development of diseases। যদিও ইহা সত্য কথা যে, চিকিৎসক যে সময়ে রোগীর চিকিৎসার্থ আহূত হয়েন, সে সময়ে রোগ সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের সীমা বা ক্রিয়াকাল অতিক্রম করিয়া স্থানসংশ্রয়ে পর্য্যবসিত হয় এবং এই সময় বা এই অবস্থা হইতে চিকিৎসক রোগ বিনিশ্চয়ার্থ নিদানাদি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং তাঁহাকে

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, সম্প্রাপ্তি ও উপশয় এই—পঞ্চধা উপায় অবলম্বন করিয়া রোগ বিনির্ণয় করিতে হয়, কিন্তু তা' বলিয়া রোগের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর—এই আন্ত অবস্থাত্রয় শল্যতন্ত্রের ব্রণ বিজ্ঞানেই হউক, আর কায়-চিকিৎসাধিকৃত জরাদি রোগ বিজ্ঞানেই হউক, বিশেষতঃ ব্রণবিজ্ঞানে একবারেই উপেক্ষণীয় নহে—সর্ব্বরোগ নিদানাধিকারে ব্রণ ও যেমন বিচার্য্য বস্তু জর ও তেমনি।

সুশ্রুত সংহিতার ব্রণ প্রশ্নাধ্যায় চিকিৎসা ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন,—ভগবান্ ধন্বন্তরির অক্ষয় কীর্ত্তি। যদি ভগবান্ ধন্বন্তরির এই অধ্যায়ধৃত অমূল্য উপদেশ সকল সুশ্রুত সংহিতায় লিপিবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিয়া আমরা সম্যকরূপে জানিতে পারিতাম না, বাতপিত্তশ্লেষ্মার প্রকৃত অর্থ কি?—কি করিয়া ত্রিধাতু অব্যাপন্ন হইয়া শরীর রক্ষা করে এবং ব্যাপন্ন হইয়া শরীরের পতন সংঘটন ও ব্যাধির সমুৎপত্তি ঘটায়।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানের Pathology বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান মঞ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান—একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া কেহ যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রোক্ত মহদুপদেশ ইহার প্রতি স্তরে অনুপ্রবিষ্ট,—প্রাচ্যের স্নিগ্ধালোকে প্রতীচ্য বিজ্ঞান কিরূপ মহিমান্বিত!

পূর্ব্বে বলিয়াছি মাধবে যাহা "পঞ্চনিদান" এই আখ্যায় আখ্যায়িত, মূল গ্রন্থ বাগ্‌ভটে তাহার নাম সর্ব্বরোগনিদান। চরক সংহিতায় কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—এই অংশ জর নিদানে পরিপঠিত। বাগ্‌ভটে সর্ব্বরোগ নিদান আগে, পরে জর নিদান। সুতরাং স্বীকার্য্য "সর্ব্বরোগ নিদান" বাগ্‌ভটের স্বকৃত সংজ্ঞা। জর নিদানে নিদানাদি-পঞ্চ রোগবিজ্ঞানে প্রকৃষ্ট উপায় এবং ইহাতে সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের উল্লেখ না থাকিলেও তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু সর্ব্বরোগ নিদান বলিতে গিয়া ত্রিধাতু বা ত্রিদোষের কথা উল্লেখ না করা এবং সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসরের কথা একেবারেই না বলা—সকলেই স্বীকার করিবেন—বিড়ম্বনা মাত্র। বাগ্‌ভট চরকসংহিতার অনুসরণ বা অনুকরণে তাঁহার পঞ্চ নিদানের শ্লোক সকল পরিগঠন করিয়া শেষভাগে ত্রিদোষের পৃথক দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাতের বিভাগ ও কারণ বর্ণনা করিয়া, শেষ একছত্রে মোটামুটি সঞ্চয় ও প্রসরের উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব-রোগ নিদান শব্দের সার্থকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু মাধব না এদিক্ না ওদিক—বাগ্‌ভটের শেষ ১১টি শ্লোক তিনি যেমন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই, তেমনি সুশ্রুতের ব্রণ প্রশ্নাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থে কিম্বা টীকাকার গণের টীকায় কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বরোগনিদানে সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি জানা উচিত—পঞ্চনিদান যাহার একাঙ্গ উপশয় তাহা General Pathologyর অন্তর্ভুক্ত হইতেই পারে না। তাই বলিতেছি—পঞ্চনিদান নামের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিনা এবিষয়ে সকলের পরামর্শ গ্রহণীয়।

লেখক—

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী।

ব্যাধির অস্বাতন্ত্র্য আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্র।

স্থান ভেদে বিভিন্ন হইলেও কারণের দিক হইতে দেখিলে ব্যাধি মাত্রেই এক। ইংরাজীতে যাহাকে oneness of diseases বলে এক অর্থ তাহাই—অস্বতন্ত্র। ভগবান্ ধন্বন্তরির উপদেশ ও এইরূপ। তিনি বলিয়াছেন,—"একই দোষ, স্থানসংশ্রয়ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন ব্যাধির রূপ প্রদর্শন করে। এই মতে পদাশ্রিত হইলে দোষ শ্লীপদের আকার ধারণ করে। সর্ব্বদেহ আশ্রয় করিলে জরাদি জন্মায়। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা তাই দোষের চিকিৎসা——ব্যাধির চিকিৎসা নহে। দোষের বলাবলের উপর তাই আমাদের সম্প্রাপ্তিবিজ্ঞান। জ্বর যেমন বাতাদিরূপে পৃথক্, দ্বন্দ্ব, সান্নিপাতিক, অতিসারও সেইরূপ। কাস, যক্ষা, হৃদ্রোগ—সমস্তই বাতাদিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে। দশমূল পাচনে বায়ুর শান্তি হয়; দশমূল সেই জন্য বাতজ্বরে, দশমূল সেইজন্য বাতব্যাধিতে, দশমূল সেইজন্য আমবাতে ব্যবহার্য্য। যেথানে বায়ুর প্রকোপ,—সেইখানেই বাতঘ্ন দশমূল—ঔষধ। জ্বরের চিকিৎসায়, যক্ষার চিকিৎসায়, বাতের চিকিৎসার ধাতু সব গুলিই আছে; শীসা হইতে স্বর্ণ পর্য্যন্ত—তবে—কম বেশী। Oneness of Disease আয়ুর্ব্বেদের Principle। ঔষধও তাই সর্ব্বত্রেই একরূপ। তাই ভগবান্ ধন্বন্তরি তাহার ব্রণ প্রশ্নাধ্যায়ে বলিয়াছেন—"তে যদোদর সন্নিবেশং কুর্ব্বন্তি তদা গুল্ম বিদ্রধি উদরাগ্নিসঙ্গানাহ বিসূচিকাতিসার প্রভৃতীন জনয়ন্তি।—

বস্তিগতাঃ প্রমেহাশ্মরী মূত্রাঘাতী মূত্রদোষ প্রভৃতীন্ * * * *
বৃষণাগতা বৃদ্ধীঃ * * *
সর্ব্বাঙ্গগতা জ্বর সর্ব্বাঙ্গরোগ প্রভৃতীন্।

ভবতি চাত্র—

কুপিতানাং হিদোষাণাং শরীরে পরিধাবতাং।
যত্র সঙ্গং স্ববৈগুণ্যাৎ ব্যাধি স্তত্রোপ জায়তে॥

(তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ)

যদি এই কথা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্যাধির বিভিন্নতা নাই। ব্যাধি কতকগুলি রূপের ও লক্ষণের সমষ্টিমাত্র। জ্বরাদির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। বৈষম্যই ব্যাধি। সাম্য ও বৈষম্য তাই আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্র। ত্রিধাতুর সাম্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদের Physiology। ত্রিধাতুর বৈষম্য এবং তজ্জনিত ক্রিয়া ইহার Pathological Physiology বা Pathology। সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর ইহার Pathogenesis। স্থান, সংশ্রয় ইহার Morbid Anatomy; পূর্ব্বরূপ রূপ ইহার Symptoms। ডাক্তারেরা Symptomsকে কোন শ্রেণী বিশেষে বিভাগ করেন না, বা করিতে জানেন না। এবিষয়ে একমাত্র আয়ুর্ব্বেদই জগতে আদর্শস্থানীয়। ঘর্ম্ম ছর্দ্দি হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কেবল আয়ুর্ব্বেদই তাঁহায় ত্রিধাতুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিতে সমর্থ। দোষের অংশাংশ কল্পনা ও বলাবল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় সিদ্ধি আনিয়া দেয়। যে চিকিৎসক এই বলাবল ও

অংশাংশ কল্পনায় সিদ্ধহস্ত তিনি চিকিৎসা-সংগ্রামে বিজয়ী।

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, ব্যাধির নাম নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও চিকিৎসকের লজ্জিত হইবার কারণ নাই। ত্রিদোষের প্রকোপ বুঝিলেই যথেষ্ট, এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। হাড় কোথায় উচু নীচু, কোথায় কোন্ শির কি ভাবে গিয়াছে, ইহা শল্যতন্ত্রের আলোচনা-বিষয়। কায়-চিকিৎসক কেবল ত্রিধাতুর সাম্য বৈষম্য মনশ্চক্ষুতে পরিদর্শন করিয়া, ইহার সঞ্চয়-প্রকোপ-প্রসরাদি জানিয়া, সংগ্রামজয়ী হইতে পারেন। পারেন যে—তাহার মূলমন্ত্র এই *Oneness of Diseases.*

লেখক—
আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ গোস্বামী।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ। *

—:*:—

'টাকে'র ঔষধ।—(১) কুঁচের মূল বা কুঁচ ফল গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া 'টাকে' প্রলেপ দিলে চুল গজাইয়া থাকে। (২) হাতীর দাঁত পুড়াইয়া, রসাঞ্জনের সহিত মিশাইয়া মধুসহ 'টাকে' প্রলেপ দিলে মস্তকের চুল গজাইয়া থাকে।

মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিবার উপায়।—(১) শিমূল কাঁটা বাটিয়া মুখে লাগাইলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। (২) মসুর দাল ঘৃতে ভাজিয়া এবং দুগ্ধের সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

মেচেতা রোগের যোগ। (১) কুল আঁটির শাঁস, নবনী, মধু ও গুড় একত্র লেপন করিলে মেচেতা রোগ ভাল হইয়া থাকে। (২) জায়ফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা রোগ আরোগ্য হয়।

দন্তশূলে সুব্যবস্থা।—অর্দ্ধভরি পিপুলের গুঁড়া, এক ভরি গব্যঘৃত এবং দুই ভরি মধু একত্র মিশাইয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূলের উপশম হয়।

কর্ণশূলে ব্যবস্থা।—(১) কয়েদ বেলের শাঁস গরম করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে। (২) ছোলঙ্গ লেবুর রস গরম করিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণা নিবারিত হয়। (৩) আদার রস গরম করিয়া কর্ণমধ্যে কিয়ৎকাল রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (৪) রসুন কিম্বা সজিনাছালের রস গরম করিয়া কর্ণমধ্যে রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণা দূর

---

* কোন চিকিৎসক পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব, তবে সেই সকল মুষ্টিযোগ এবং টোট্‌কা তাঁহার নিজের পরীক্ষিত হওয়া চাই।

আঃ সং।

হইয়া থাকে। (৫) কলার মাজের রস গরম করিয়া কর্ণবিবরে রাখিলে কর্ণশূলের যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।

পাথুরির ঔষধ।—(১) গোক্ষুর বীজের গুঁড়া, মধু এবং ছাগ দুগ্ধ একত্র পান করিলে পাথুরি রোগে উপকার হয়। (২) রাখালশশার মূল ও তালমূলী একত্র বাসি জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে পাথুরী রোগে উপকার হয়। (৩) নারিকেলের মূল এবং যবক্ষার একত্র জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে পাথুরিরোগে উপকার পাওয়া যায়।

প্রমেহে টোট্‌কা।—(১) পলাশ ফুল এক ভরি এবং অর্দ্ধভরি চিনি শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে প্রমেহরোগে উপকার পাওয়া যায়। (২) জলপূর্ণ একটি নারিকেলের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফটকিরির চূর্ণ গুলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া এক রাত্রি কাদার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে সেই জল বারম্বার পান করিলে বহু দিনের মেহ রোগের কষ্ট নিবারিত হয়। (৩) দুগ্ধ এবং শতমূলীর রস একত্র সেবন করিলে প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে। (৪) কণ্টকারির শিকড় বাটিয়া মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে প্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে।

আগুনে পুড়িয়া ঘা হইলে ব্যবস্থা।—(১) তিল এবং যব ভস্ম সমান ভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ক্ষত আরোগ্য হয়। (২) তিলের তৈল আর যব ভস্ম একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে এরূপ ক্ষতের উপশম হয়। (৩) যব এবং যবচূর্ণ একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে জ্বালার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। (৪) পাকা তেঁতুল গুলিয়া লেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের উপশম হইয়া থাকে। (৫) গোল আলু বাটিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রদান করিলে যন্ত্রণায় আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

তামাকের অপকারিতা।

—*—

পূর্ব্ব সংখ্যায় "তামাকের ইতিবৃত্ত' নামক প্রবন্ধে উহার অনিষ্টকারিতার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার বিশদ বিবরণ জন্য ডাঃ কিলগের মন্তব্য হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি,—

রক্তের উপর তামাকের ক্রিয়া।—যে কোন প্রকারে তামাক সেবন করা হউক না কেন, অর্থাৎ কলিকায় সাজিয়া, হুঁকা-গড়গড়া দ্বারা, বিড়ি-চুরুট ও সিগারেট আকারে বা পাইপ দ্বারা গুঁড়া তামাক সাজিয়া ধূমপান বা নস্য গ্রহণ বা দোক্তা ভক্ষণ—সকল প্রকারেই এই তামাকের বিষ সত্বর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহা দ্বারা রক্তের যে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, ডাঃ রিচার্ডসন্ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"বহুকাল তামাকের ঘ্রাণ লইলে রক্তের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া

যায়। ইহা স্বাভাবিক অপেক্ষা তরল হয় এবং কঠিন স্থলে ইহার রক্তিমাভ হ্রাস হয়। কোন কোন স্থলে রক্তের এই প্রকার বর্ণ-তারল্য সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বহিত্বক পীতাভ-শ্বেতবর্ণ ও স্ফীত হয়। রক্তের তারল্য বশতঃ ইহার স্রাব অতি সহজেই হয় এবং কর্ত্তিত স্থান প্রভৃতি হইতে বহুক্ষণ রক্ত নির্গত হয়, ঔষধ সেবনেও সহজে বন্ধ হয় না। মনুষ্য-শোণিতে অসংখ্য রক্তকণিকা থাকে, উহাদের আকৃতি গোলাকার, উভয় দিক থাল, ধারগুলি পরিষ্কার। তামাকের ধূম রক্তে শোষিত হইয়া সত্বর এই সকল রক্ত-কণিকাগুলির গঠনের পরিবর্ত্তন হয়। গোলাকারের পরিবর্ত্তে ডিম্বাকৃতি ও ধারগুলি অপরিষ্কার হইয়া থাকে এবং সুস্থাবস্থার ন্যায় রক্ত-কণিকাগুলি ঘনীভূত না থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই রক্ত দুর্ব্বল শরীর হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।"

তামাক যে কেবল রক্তের হীনতা ও বিষক্রিয়া সাধন করে এবং তাহার ফলে রক্তকণিকাগুলির দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়,—এমন নহে, ইহা হইতে স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ারও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে তামাকের দ্বারা রক্তের হীনতা সাধিত হইয়া, শরীরের রোগ-প্রতিরোধিণী-শক্তি কমিয়া যায়; সুতরাং সেই অবস্থায় সহজেই রোগ জন্মিতে পারে।

তামাক ব্যবহারের অপকারিতা সকল বয়সেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণবয়সের পূর্ব্বে বা বাল্যাবস্থায় ইহার অপকারিতা আরও বেশী। ইহা দ্বারা শরীরের বর্দ্ধন-শক্তির হ্রাস, অকাল-বার্দ্ধক্য ও দৈহিক-দৌর্ব্বল্য উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন অভিযাত্রায় ১১ জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসে। সেই ২ জন তামাক সেবন করিতেন না।

ধূমপায়ীদের গলক্ষত

(Smoke's Sorethroat)—ধূমপায়ীদের মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সমূহের যে আরক্তিম ও শুষ্কতা সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয়, উহা বিষধর্ম্মী-তাম্রকূট পত্রের উত্তপ্ত ধূম জনিত উত্তেজনার ফল। ধূমপান পুরাতন গলক্ষতের একটী সাধারণ কারণ; সেই জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Smokers Sore throat বা ধূমপায়ীদের গলক্ষত বলিয়া একটী স্বতন্ত্র রোগের নাম করণ হইয়াছে। কোন কোন ধূমপায়ী গলরোগ শান্তির ভাণ করিয়া, তামাকের ধূমপান করেন; কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের কেবল ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ তামাকে গলক্ষত রোগ আরোগ্য হয় না, ইহা দ্বারা কখন কখন স্থানীয় উত্তেজনার উপশম হয় মাত্র, কিন্তু ফলে ইহা হইতে রোগ প্রায়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

তামাক ও ক্ষয়রোগ।—

অবিশুদ্ধ বায়ু ফুসফুসের পীড়া সমূহের একটী কারণ। শ্বাস দ্বারা অবিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ ক্ষয়-কাশের একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রক্ত ও ফুসফুসের উপর বায়ু মধ্যস্থ বিষধর্ম্মী পদার্থ সমূহের বিষক্রিয়া দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। এমন কি, রক্তের যে সকল দূষিত পদার্থ আমাদের প্রশ্বাস-বায়ু দ্বার পরিত্যক্ত হয়, উহা শ্বাস দ্বারা পুনর্গ্রহণও নিরাপদ নহে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে

যে, নিকোটিন্ মিশ্রিত উষ্ণ ধূম দ্বারা ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া পূর্ণ করাও ক্ষয়রোগের একটী প্রধানতম কারণ—পরিদর্শন দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। লণ্ডনের মেট্রোপলিটান ফ্রি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি আর, ড্রাইস্‌ডেল্ পাবলিক 'হেল্‌থ' নামক পত্রে একটী প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে,—বাল্যাবস্থায় বা পূর্ণাবস্থার পূর্ব্বে ধূমপান-অভ্যাস ক্ষয় রোগের একটী কারণ।

তামাক হৃদ্‌রোগেরও একটী কারণ।—নাড়ী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার পরিচায়ক। হৃৎপিণ্ডের উপর তামাকের বিষক্রিয়া নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তামাক সেবন করার অব্যবহিতকাল পরেই কাহারও নাড়ী-পরীক্ষা করিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, হৃৎপিণ্ড কিয়ৎ পরিমাণে অবশ হইয়াছে এবং উহার বেগ ও ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। পুরাতন ধূমপায়ীদের মধ্যে হৃৎকম্পন বা বুক ধড়ফড়ানি, সবিচ্ছেদ নাড়ী, হৃদয়ের স্নায়ুশূল ব্যথা ও হৃদ্‌রোগের অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা কেবল বৎসর কয়েক মাত্র এই অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোকের এই সব লক্ষণ দেখা যায়না, কিন্তু ক্রমশঃ বহুকাল সেবন করিতে করিতে একে একে উপরোক্ত লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইতে থাকে। তালিকা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ধূমপায়ীদের প্রত্যেক চতুর্থ ব্যক্তির এই সব লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ চারিজন ধূমপায়ীর মধ্যে অন্ততঃ একজনের এই সব লক্ষণ দেখা যায়। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, তামাক ব্যবহারে যে কেবল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যত্যয় হয় তাহা নহে, ইহার ফলে যান্ত্রিক পীড়াও উৎপন্ন হইতে পারে।

তামাক ও অজীর্ণ রোগ।—কেহ কেহ তামাককে অজীর্ণ রোগের মহৌষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু শত শত স্থলে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইহা দ্বারা অজীর্ণরোগ আদৌ আরোগ্য হয়না, বরং অনেক স্থলেই ইহা অজীর্ণের কারণ হইয়া থাকে। তামাক একটী অবসাদক মাদক। এই শ্রেণীস্থ মাদক সাধারণতঃ পাকাশয়ের ক্রিয়ার কার্য্যকরী-শক্তি নষ্ট করিয়া আমাশয়িক রসের স্রাবাল্পতা ঘটায়। তামাকের এই গুণ অত্যন্ত প্রবল। তামাক সেবনকারী তামাক বা অন্য কোন মাদক সেবনে ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধন করিতে পারে। ইহা দ্বারা আহারেচ্ছা দমন হয় বটে, কিন্তু খাদ্য দ্বারা দেহস্থ যে অভাব পরিপূরণ হইত, সে অভাব মোচন হয় না। তামাকের এই অবসাদক-শক্তিদ্বারাই পরিপাক-ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। নস্য গ্রহণেও ক্ষুধামান্দ্য হয়। ইহা দ্বারা নাসাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহ উত্তেজিত হয় এবং সহানুভূতিজনক স্নায়ুর ক্রিয়ায় পরে আমাশয় ও আক্রান্ত হয়।

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ধূমপান, নস্য গ্রহণ বা দোক্তা চর্ব্বণ করেন,—তাঁহার ক্ষুধামান্দ্য বা অজীর্ণরোগ হইতেই হইবে। এইরূপে পরিপাকশক্তির হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ ও মাংসহীন হইয়া যায়। অতি স্থূলকায় ব্যক্তিকে দোক্তা খাইয়া অল্পকাল মধ্যে শীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। যাঁহারা অত্যধিক তামাক সেবন করেন, তাঁহারা অজীর্ণরোগে আক্রান্ত

হইলে, তাঁহাদিগকে তামাক ত্যাগ না করাইয়া কেবল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা দুঃসাধ্য।

তামাক ও ক্যান্সার বা কর্কট ঘা।—তামাক সেবন এই ভয়াবহ রোগের একটী নিঃসন্দেহ কারণ। খ্যাতনামা অস্ত্র-চিকিৎসক সকলেই বলেন যে, অধর ও জিহ্বায় ধূমপানজনিত কর্কট ঘা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা (Smoker's Cancer) স্মোকার্স ক্যান্সার নামে অভিহিত হইয়াছে। লণ্ডন নগরের ক্যান্সার হাস-পাতালের রোগী-সংখ্যার তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও তথায় স্ত্রীরোগীর সংখ্যা পুরুষের পাঁচগুণ, তথাপি অধর ও জিহ্বার ক্যান্সার্ পুরুষদের মধ্যে অধিক অর্থাৎ স্ত্রীলোকের তিনগুণ। ইহার কারণ পুরুষদের মধ্যে ধূমপান অধিক প্রচলিত।

তামাকজনিত পক্ষাঘাত।—এক প্রকার পক্ষাঘাত বা অবশতা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে ক্রমে ক্রমে মাংস-পেশীর ক্ষমতা হ্রাস ও ক্ষয় হয়। গত ৪০।৪৫ বৎসর ধরিয়া এই রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তামাক ব্যবহারের বৃদ্ধিই এই রোগ-বৃদ্ধির কারণবলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কারণ এই রোগ অধিকাংশ স্থলে তামাক সেবনকারীদের ভিতর দেখা যায়।

তামাক সেবনে অক্ষিস্নায়ুর এক প্রকার ক্রমিক অবশতা হয়। উহাতে দৃষ্টি হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে দৃষ্টিহীন হয়। চক্ষু-চিকিৎসকেরা এই রোগকে টোব্যাকো এমোরসিস্ বা টোব্যাকো ব্লাইণ্ডনেস্ অর্থাৎ তামাক জনিত অন্ধত্ব বলেন। এই রোগ তামাক ত্যাগ করিলে সারিয়া যায়, কিন্তু তামাক না ছাড়িলে আরোগ্য হয় না। আয়র্লণ্ডে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, কারণ তথাকার অধিবাসীরা অতি উগ্র তামাক ব্যবহার করেন। ধূমপান এবং দোক্তা চর্ব্বণ—উভয় কারণেই এই রোগ হয়।

বর্ণান্ধতা নামক এক প্রকার রোগ আছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে কোন পদার্থের প্রকৃত বর্ণ রোগীর বোধগম্য হয় না। বেল-জিয়ম ও জর্ম্মনিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার তত্ত্বানু-সন্ধানের জন্য বেলজিয়াম্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত জনৈক খ্যাতনামা বেলজিয়াম্-চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তামাকের বহুল প্রচলনই ইহার কারণ। পরে অন্যান্য চিকিৎসকেরাও তাঁহার এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

তামাক স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের কারণ।—তামাক সেবনকারীর মধ্যে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য নানাপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ সহজেই চমকিয়া উঠে; কেহ অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতি, কোপনস্বভাব ও কটু-ভাষী; কাহারও বা রাত্রে নিদ্রা হয় না; আবার কাহারও লিখিবার সময় হাত কাঁপিতে থাকে। আবার অনেক স্থলে তামাক ত্যাগ করিয়া এই সকল দোষাবলী অপসারিত হইতেও দেখা গিয়াছে। তামাক সেবনে প্রথমতঃ স্নায়ু সমূহের সাময়িক বলা-ধান বা শক্তিসাধন হয় বলিয়া অনুমান হয় বটে; কিন্তু এই অনুমান ভ্রমোৎপাদক মাত্র; শেষে দৌর্ব্বল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

স্ত্রী ও শিশুগণের মধ্যে প্রায়ই নানারূপ স্নায়বিক বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা তাহাদের কৈশোর-শরীরে ধূমপায়ী স্বামী বা পিতৃদেহ হইতে প্রাপ্ত তামাকের বিষের ফল।

ডাক্তার এল, জি; আলেকজাণ্ডার এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, স্নায়ু-দুর্ব্বল ব্যক্তি, স্নায়ুর ব্যথা, স্নায়ুশূল ও নানাপ্রকার স্নায়ুপীড়ার সংখ্যা অধুনা এত সত্বর বৃদ্ধি হইতেছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মনসংযোগ আবশ্যক। তিনি বলেন যে, তামাক, সুরা ও অহিফেনের বহুল ব্যবহারই এই স্নায়ুরোগের প্রধানতম কারণ।

ফলতঃ ইহা নানাপ্রকারে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরুষত্বহীনতা ও অন্যান্য স্নায়ুপীড়ার একটী প্রবান কারণ তামাক সেবন।

তামাক সেবনের কুলক্রমাগত পরিণাম।—যে সকল কু-অভ্যাসের কু-পরিণাম বংশানুক্রমে ভোগ হইয়া থাকে,তামাক সেবন তাহাদের কোনটী অপেক্ষা ন্যূন নহে। কোন প্রবল বলশালী ব্যক্তি আজীবন নির্ব্বিঘ্নে তামাক সেবন করিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহার কোন অনিষ্টই হইলনা; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার পুত্রেরা অমূল্য বল ও নীরোগ স্বাস্থ্য রত্নরূপ পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়া রোগপ্রবণ ও অকালজরাসঙ্কুল দেহ লইয়া অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। যাঁহারা অতিমাত্রায় তামাক সেবন করেন, তাঁহারা সবল হইলে, তাঁহার পুত্রেরা পিতার ন্যায় সবল দেহ হন না; এবং ঐ পুত্রেরাও যদি তামাক অতি মাত্রায় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পৌত্রেরা নিশ্চয়ই স্নায়ুদুর্ব্বল, ক্ষীণ ও রুগ্নদেহ হয়,—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পর্য্যালোচনা দ্বারা এই বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তামাক সেবনে মনোবৃত্তির ব্যত্যয়।—তামাক চরিত্রবল নষ্ট করে, চিত্তের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, বিবেককে একেবারে হীনবল করিয়া ফেলে এবং চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতা ধ্বংস করিয়া স্থূলতা সম্পাদন করে। যাঁহারা যৌবনের প্রারম্ভে তামাক সেবন অভ্যাস করেন অর্থাৎ যে সময় মানসিক বৃত্তি সকলের প্রথম বিকাশ আরম্ভ হয়—সেই সময় তামাক সেবন আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লিখিত দোষগুলি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

নস্যগ্রহণের অপকারিতা।—নস্যদ্বারা অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য রোগ জন্মিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নাসাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ক্ষয় হয়, এবং তদ্গাত্রস্থ গন্ধবহা স্নায়ুসমূহ অবশ হইয়া পড়ে। এইরূপে ঘ্রাণশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়। বহুদিন নস্য ব্যবহারে অনুনাসিক বর্ণ সমূহের স্পষ্ট উচ্চারণ দুরূহ হইয়া পড়ে। প্রায়ই অনুনাসিক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। 'গঙ্গা'র পরিবর্ত্তে "গগ্গা" "কোন্নগর" এর পরিবর্ত্তে 'কোম্নগর' ইত্যাদি প্রকার উচ্চারণ হয়। নস্যের সহিত চুণ থাকায় নাসারন্ধ্রে ক্ষতও হয়।

তামাকের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হইল। তামাকের সপক্ষেও দুই এক কথা কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে সেই গুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, সুরার ন্যায় তামাকও শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে। সুতরাং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ইহা দ্বারা স্বাভাবিক স্রাব সমূহ কমিয়া যায় বলিয়া খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। সে কারণ ইহাকে খাদ্য স্থানীয় করা যাইতে পারে না। নাইট্রিক্ এসিড, পারদ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহারে যেরূপ শরীরা-

ভ্যন্তরস্থ স্রাব কমিয়া থাকে, অলসতার সহচর হইলে যেরূপ ঐ স্রাব কমিয়া থাকে,—ম্যালেরিয়া বিষে শরীর আক্রান্ত হইলেও ঐ স্রাব যেরূপ কমিয়া থাকে, তামাক সেবনের ফলেও দেহাভ্যন্তরস্থ স্রাবাল্পতা সেইরূপ। কিন্তু স্রাব কম হওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর ভিন্ন হিতকারী নহে। যকৃতের ক্রিয়াহীনতা, অর্থাৎ পিত্তনিঃসরণের স্বল্পতা, চর্ম্মের ক্রিয়াহীনতা অর্থাৎ স্বেদনিঃসরণের হ্রাসতা, মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া-ব্যত্যয়, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি দ্বারা যে স্বাভাবিক স্রাব কমিয়া যায়, তাহাতে মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের ব্যাঘাতই ঘটিয়া থাকে এবং এই সকল ব্যাধি তামাকসেবনের ফল।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, অতিরিক্ত সাময়িক শ্রমের পর যখন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়, তখন তামাক সেবনে মস্তিষ্ক শীতল হয় ও সুনিদ্রা হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তামাক দ্বারা ইহার বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে তামাক সভ্যজগতে বহু প্রচলিত হইয়াছে, যে তামাক সভ্যজাতীর আদরের সামগ্রী হইয়াছে, যে তামাক বৈঠকী-মজলিসে ভদ্রতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে, যে তামাক অভ্যাগতের যথোচিত সম্ভাষণ প্রকাশ করিতেছে, যে তামাককে আমরা বিশ্রামের সহচর ও সন্তাপের শান্তিদায়ক মনে করিয়া সমাদর করি ও যাহাকে চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছি, সেই তামাক যে আমাদের গুপ্তশত্রু, আমাদের প্রাণহন্তা, আমাদের স্বাস্থ্যহানীর মূল, আমাদের রোগ-ভোগের কারণ, এবং সুখ-শান্তির প্রধান প্রতিবন্ধক, তাহা যদি এই প্রবন্ধ পাঠে পাঠকগণের উপলব্ধি হয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও যদি এই গুপ্তশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে প্রবন্ধ লেখকের শ্রম সফল হইবে।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার মূল সূত্র।

(২)

অগ্নিদগ্ধ স্থানে অগ্নির উত্তাপ।—

আপাত-বুদ্ধিতে বোধ হয় শৈত্য, সংযোগে অগ্নি দাহের উপশম হইতে পারে, অতএব দগ্ধ স্থানে শীতল জল সেচন করাই উচিত। বস্তুতঃ ঐরূপ শীত-প্রক্রিয়ায় উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে। কারণ শীতল জল স্বাভাবিক-সঙ্কোচন-শক্তি বশতঃ দগ্ধ স্থানে রক্ত জমাট করিয়া থাকে, পরে ঘনীভুত রক্ত পাক প্রবল হইয়া পড়ে, কিন্তু দগ্ধস্থানে অগ্নির তাপ লাগাইলে তাপের সঞ্চালন শক্তি বশতঃ রক্ত চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হয়, জমাট বান্ধিতে পারে না। সুতরাং পাকিবারও আশঙ্কা থাকে না। অধিকন্তু আভ্যন্তরিক-প্রক্রিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে এ তাপও হেতু বিপরীত ঔষধ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবে।

বিষে বিষ ক্ষয়।—ইহা হইবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিষের নাশক যেমন স্থাবর মৌল জঙ্গম বিষের ঔষধ; তেমনি জঙ্গম বিষ স্থাবর মৌল বিষের ঔষধ, কেন না উভয় প্রকার বিষ, বিষগত বিষয়ে এক হইলেও বস্তুগত্যা পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়াশীল। জঙ্গম বীষ উৰ্দ্ধগামী, এবং স্থাবর বিষ অধোগামী, ঈদৃশ বিপরীত ক্রিয়াকারী বলিয়া হেতু বিপরীত ঔষধের মধ্যে বলিয়া ধর্ত্তব্য।

মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগে মদ্যপান।—টীকাকারগণ এই উদাহরণে দুইটী উপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; প্রথম উপপত্তি—মদ্য মাত্রই সদৃশ গুণযুক্ত এমন কথা হইতে পারে না, কোন মদ্য রুক্ষ, কোন মদ্য বা স্নিগ্ধ ইত্যাদি, সুতরাং কোন মদ্যের সহিত কোন মদ্যের বিরোধিতাও অবশ্যই আছে। অতএব রুক্ষ মদ্যপান করিয়া যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে স্নিগ্ধ মদ্য পান করাইবে। এইরূপ স্নিগ্ধ মদ্য পানে যাহার পীড়া হইয়াছে, তাহাকে রুক্ষ মদ্য পান করিতে দিবে। কাজেই এবম্বিধ ব্যবহার-কার্য্যও হেতু বিরোধী হইল। দ্বিতীয় উপপত্তি এই যে, যে স্থলে কোনরূপ দ্রব্যান্তরের সহিত ঐ মদ্যের বিপরীত ক্রিয়া আনয়ন করিয়া হেতু-বিরোধী করিয়াই লইতেছে, সুতরাং উহা হেতু-বিপরীত ঔষধের মধ্যেই গণ্য হইল।

ব্যায়াম জনিত বাত রোগীর জল সন্তরণরূপ ব্যায়াম।—যেরূপ কুম্ভকারের পয়োনস্ত অগ্নি, উপরিস্থিত মৃত্তিকালেপের আবরণে সংবৃত থাকায়, অভ্যন্তরে পিণ্ডীকৃত হইয়া সমধিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ সন্তরণকারী ব্যক্তির আভ্যন্তরিক তাপ-জলের শৈত্য ক্রিয়া বশতঃ লোমকূপ পথে বহির্গত হইতে না পারিয়া অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই তাপের সহায়তায় মেদ ও শ্লেষ্মা গলিত হয়, তৎসহকারে সন্তরণ শ্রমোৎপন্ন বায়ু পূর্ব্ব সঞ্চিত বাতকে স্বস্থানে আনয়ন করে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও হেতু-বিপরীত ঔষধের মধ্যেই পরিগণিত হইল। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই বিপরীতার্থকারী ঔষধ আভ্যন্তরিক-ক্রিয়া প্রভৃতির কারণ বশতঃ বিপরীত ঔষধ বলিয়াই গণ্য হইল, তাহা হইলেই উহাকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিবার তাৎপর্য্য কি? এবং (সদৃশ ঔষধ) নাম করণ করিবারই বা সার্থকতা কোথায়? আমরা এ স্থলে টীকাকারগণের ব্যাখ্যা বিবৃত মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিতেছি। যদিও বিপরীতার্থকারী ঔষধ প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত ঔষধেরই অন্তর্নিবিষ্ট, তথাপি উক্ত ঔষধের ধর্ম্মগত আংশিক বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য পৃথক্ শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। যদি বল, বৈলক্ষণ্য কি? আপাততঃ সমধর্ম্মী বা সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াই বৈলক্ষণ্য।

পূর্ব্বে যে হেতু-বিরোধী, ব্যাধি বিরোধীও উভয় বিরোধী ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঔষধ যথেচ্ছাভাবে অর্থাৎ যে স্থানে যেমন ইচ্ছা হইল—তদনুসারে প্রয়োগ করিলেই চিকিৎসার সুফল হইতে পারে না। ইহাতে অনেক বিচার ও বিতর্ক করা চাই। ইহাদের প্রয়োগের স্থল সকলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেই সকল বিষয় ও ক্ষেত্র প্রণিধান পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাই সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য। আজ কাল আমাদের

দেশে যে ভাবে বৈদ্য-চিকিৎসা চলিতেছে, অধিকাংশ বৈদ্য যে হিসাবে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহার আভ্যন্তরীণ বিবরণ অনুসন্ধান করিলে হতশ্রদ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার অভাবে উহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য লুপ্ত হওয়ায় "ঢেলামারা চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পূর্ণ-বিজ্ঞানময় হইয়াও ব্যবহার-দোষে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহা দেখিয়া প্রতিযোগী চিকিৎসকগণ অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপহাস করিতে-ছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যতদিন দেশীয় চিকিৎসকগণ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্মাননা না করিতেছেন, প্রকৃত ভাবে ঋষির আদেশ কার্য্যে পরিণত না করিতেছেন, ততদিন উক্ত কলঙ্ক অপনোদনের পন্থা নাই।

১ম। হেতু বিরোধী ঔষধের প্রয়োগস্থল। রোগের হেতু অনেক প্রকার। সংক্ষেপে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বাহ্য হেতু ও আভ্যন্তর হেতু। আহার, আচরণ, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিকে বাহ্য হেতু এবং কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, মল মূত্র প্রভৃতিকে আভ্যন্তর হেতু বলা যায়। কোনও রোগই হেতু বিনা উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং হেতু সংঘটন হইবা মাত্রই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া-বিশেষ ব্যতীত কোনও রোগই জন্মিতে পারে না। বীচি তরঙ্গ ন্যায় অনেকগুলি ক্রিয়া অপেক্ষা করে। একটীর পর আর একটী ক্রিয়া; তৎপরে অপর একটী ক্রিয়া—এইরূপ পরস্পরিত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া জন্মাইয়া পরিণামে যে ক্রিয়া বা ফল প্রকাশ করে, তাহারই নাম রোগ। যে সমস্ত রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, তাহা-তেও প্রায় ইহার ব্যভিচার নাই। তবে শত পত্র বেধের ন্যায় অতি অল্প সময়েই উৎপন্ন হয় বলিয়া সর্ব্বদা অনুভূত হয় না। এই সমস্ত ক্রিয়ার যথা ক্রমিক নাম,—(১) সঞ্চয় (২) প্রকোপ (৩) প্রসর (৪) স্থান সংশ্রয় (৫) অভিব্যক্তি এবং (৬) ভেদ। এই ক্রিয়া গুলিকে শরীরের এক একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে, এবং ঐ সকল অবস্থার বৃদ্ধির নাম সঞ্চয়, এবং ঐ সঞ্চিত বায়ু প্রভৃতি যৎ-কালে প্রবল ভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকে প্রকোপ বলা যায়। প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতির স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের নাম প্রসর; এবং স্থানান্তর আশ্রয় করিলে সেই অবস্থাকে স্থান-সংশ্রয় বলে। স্থান-সংশ্রিত বাত বা পিত্ত প্রভৃতি যৎকালে কোন রোগের ধর্ম্ম প্রকাশ করে, সেই অবস্থাকে অভিব্যক্তি এবং বায়ু পিত্ত প্রভৃতি স্পষ্ট ধর্ম্ম যাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকে ভেদ কহে। অগাধ মতি সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ ঐ সকল লক্ষণ অবগতির জন্য যেরূপ গভীর চিন্তা-গবেষণা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত ও ভক্তি-ভাবে বিগলিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টা কেবল লক্ষণানুসন্ধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, প্রত্যেক অবস্থায় চিকিৎসারও বিধান করিয়া-ছেন। এক এক অবস্থায় চিকিৎসার সময়কে এক এক চিকিৎসা-কাল বলে, তদনুসারে প্রথম চিকিৎসাকাল, দ্বিতীয় চিকিৎসা কাল ইত্যাদি সংজ্ঞা বৈদ্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দোষের সঞ্চয় হইতে স্থান-সংশ্রয় পর্য্যন্ত এই চারিটী অবস্থার অর্থাৎ যতদিন রোগ অভিব্যক্ত না হয়,—পূর্ব্বরূপ অবস্থায়

থাকে, কিম্বা প্রবলাকার ধারণ না করে, ততদিন হেতু বিরোধী ঔষধ যুক্তিসঙ্গত, অপিচ যে স্থলে কারণের সহিত রোগের অধীনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ কারণের ধ্বংশ হইলে রোগেরও বিনাশ হইতে পারে, পক্ষান্তরে কারণের অবস্থিতি বশতঃ রোগের স্থায়ীত্ব অনুভূত হয়, সেই স্থলে হেতু-বিরোধী ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে,—১ম মনে কর—হিমসম্পর্ক ; দধি সেবন এবং এইরূপ কোন কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়াছে, এবং ঐ সঞ্চিত শ্লেষ্মা প্রকোপ প্রভৃতি ক্রমাগত অবস্থান্তর সকল প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা কোন প্রকার রোগের সূচনা করিয়াছে—এমন স্থলে বমন, লঙ্ঘণ বা এইরূপ কফ নাশক উপায় দ্বারা শ্লেষ্ম-নিঃস্মরণ বা শোষণ করা। এইরূপ প্রতীকার দ্বারা রোগের হেতু বা মূল কারণ বিনষ্ট করা। সুতরাং রোগের ভবিষ্যদাক্রমনের আশঙ্কা থাকে না। মহর্ষি সুশ্রুত এইরূপ প্রতীকারের বিশেষরূপ প্রশংসা করেন।

সঞ্চয়াঞ্চ প্রকোপাঞ্চ প্রসরং স্থান সংশ্রয়ম্
ব্যক্তিং ভেদঞ্চ যো বেত্তি দোষাণাং
সভবেদ্ ভিষক্।
সঞ্চয়ৈপ হৃতাদোষা লভন্তে নোত্তরাগতীঃ
তাস্ত্বতরাস্থ গতিষু ভবন্তি বলবত্তরাঃ
সূত্রস্থান।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়ু পিত্ত প্রভৃতির সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রসর, স্থান, সংশ্রয়, ব্যক্তি ও ভেদের স্বরূপ ও লক্ষণ সুন্দররূপে অবগত আছেন, এবং তৎ-সাময়িক প্রতিকারে সক্ষম, তিনি সুচিকিৎসক। যৎকালে শরীরে দোষের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে উহা সমূলে বিনষ্ট হইলে, আর উত্তরোত্তর গতি অর্থাৎ প্রকোপ, প্রসর প্রভৃতি প্রশস্ত হইতে পারে না। দোষ যত উত্তর গতি (Degree) লাভ করে, ততই তাহার প্রবলতা হয়।

ফলতঃ দোষের সঞ্চার হওয়া মাত্র তাহার প্রতি বিধান করাই উত্তম কাজ। এইরূপ ক্রিয়ায় অনায়াসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাবী রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

২য়। রোগের অপ্রবল অবস্থায় অর্থাৎ যতদিন সামান্যাকার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, বৈদ্যশাস্ত্রে সেই অবস্থাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ বলে। সে অবস্থায়ও হেতু বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু এই মত সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

৩য়। যে স্থলে হেতুর সহিত রোগের অধীনাভাব সম্বন্ধ, সে স্থলে হেতু-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। মনে কর, যেমন ক্রিমি বা মল সঞ্চার বশতঃ উদরে বেদনা জন্মিয়াছে—এমন স্থলে বেদনা নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ কোন উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই, সে অবস্থায় যাহাতে বেদনার কারণ ভূত ক্রিমি বা মল নিঃসারিত হয় তদনুরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৪)। কেহ কেহ রোগের হেতু ত্যাগকেও হেতু-বিরোধী-চিকিৎসা বা ঔষধের মাত্রা গণনা করিয়া থাকেন। কেননা নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, আহার ও আচরণাদি রোগের নিদান, তৎসমুদয়ের নিয়ম পালন না করিলে রোগের উপশম হয় না, কারণ ঐরূপ আহার-বিহারাদি দ্বারা দোষের বল বৃদ্ধি হয়,

দোষ বলীয়ান হইয়া রোগের বল বৃদ্ধি করে অথবা আরোগ্যের প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। এমন স্থলে ঔষধ দেওয়া না দেওয়া তুল্য। এজন্য অনেক রোগী সুবিজ্ঞ বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াও একমাত্র নিদান সেবনের দোষে আরোগ্য লাভে বঞ্চিত হয়েন্। অতএব আহার, আচার প্রভৃতি যে প্রকার নিদানই কেন হউকনা—প্রথমতঃ তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা আরোগ্যার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে কেবল নিদান পরিত্যাগ করিয়াও অনেক ব্যক্তিকে রোগ হইতে মুক্তি পাইতে দেখা যায়। নিদান-পরিত্যাগের সংক্ষিপ্ত নাম নিদান পরিবর্জ্জন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, "সংক্ষেপতঃ ক্রিয়া যোগা নিদান পরিবর্জ্জনম্" পরন্ত এই মতটী হেতু বিপরীত বলিয়া কেহ কেহ স্মরণ করেন না।

ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগের স্থল।—রোগের অভিব্যক্ত বা পরিস্ফুট অবস্থায় ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এমন অনেকগুলি ঔষধ দ্রব্য আছে, রোগ যে কারণেই হউক না কেন, সেই সমস্ত ঔষধ-প্রভাব-শক্তি বশতঃ কারণ-নির্ব্বিশেষে রোগ প্রতীকারে সমর্থ, অর্থাৎ রোগ বায়ু, পিত্ত বা যে কোন হেতুতেই উৎপন্ন হউক না কেন, তৎপ্রতি ঔষধের লক্ষ্য থাকে না, কেবল রোগ প্রশমনের প্রতিই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইংরাজী ভাষায় ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট শক্তি সম্পন্ন ঔষধকে স্পেসিফিক্ মেডিসিন্ (specefic medicene) বলা যাইতে পারে। এরূপ ঔষধের সংখ্যা অতি অল্প। পরন্ত একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে চিকিৎসকের চিন্তা এবং শ্রমের লাঘব হইবে বলিয়া লোকহিতৈষী ঋষিগণ উহাদের অনুসন্ধানে সমধিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং ভূরি পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ তাঁহাদের ফার্ম্মাকোফিয়া গ্রন্থে যেমন ক্রিয়ানুসারে অল্টার্নেটিব্ পার্গেটিব ইত্যাদি শ্রেণীভেদে ঔষধ সমুহের বিভাগ করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ তেমনি দাহ নাশক, ইত্যাদি ভেদে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

(ক) অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, বৈদ্য-শাস্ত্রের ঔষধ নিতান্ত অন্ধকারে ঢেলামারার ন্যায়। বৈদ্যগণ শবচ্ছেদন করেন না, সুতরাং শারীরিক যন্ত্র বা তাহাদের ক্রিয়ার বিষয় ইহারা কিছুই জানেন না। ইহাদের শাস্ত্রও কেবল অনুমানের উপরে লিখিত, শারীরিক যন্ত্রাদির প্রত্যক্ষের সহিত ইহার কোন সংশ্রবই নাই; অতএব উহাদের চিকিৎসা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।

যাঁহারা বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন বা স্পর্শ করেন নাই, তাহাদের ঐরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে। যে সকল জাতি এইক্ষণে সভ্যতম বলিয়া গণ্য, এক সময়ে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল যে, এই চিকিৎসা-শাস্ত্র কি? অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি?—ইহা তখন ইহাদের কল্পনায় ও উপস্থিত হয় নাই। তৎকালে হিন্দুগণ শারীরিক চর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। নরদেহ কিরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, যন্ত্রাদির আকারপ্রকার গতিবিধি কিরূপ, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ইংলণ্ড অল্পদিন মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হিন্দুগণ অনেক

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলেন। হিন্দুগণের শাস্ত্র যাঁহারা কাল্পনিক বলেন, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

আজিকালি কতকগুলি ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, বৈদ্য-চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক নহে। উহা বৎপরোনাস্তি ভ্রম-সঙ্কুল। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বৈদ্যশাস্ত্র কখন স্পর্শও করেন নাই, কেবল হুজুগের কল রবেই চালিত।

(খ) দৈহিক উপকরণের অযথা হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দৈহিক তাড়িতের (পঞ্চোষ্মাণঃ সমাভয়াঃ) অসামঞ্জস্যে (Disturbance of the Equilibrium of the Auinal Mageatisan) যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা আর্য্য ঋষিগণ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। কালে বিজ্ঞার জ্যোতিঃ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, উক্ত জ্ঞান-গর্ভ বাক্যের মহিমা ততই প্রতিপাদন করিতেছে। রোগ মাত্রেই উহা অসমতার পরিণাম মাত্র। শোণিতে জলীয় ভাগ অধিক হইলে উহা রোগ; লৌহের অংশ অল্প হইলে রোগ। পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য হইলে রোগ, অম্লের অল্পতাও রোগ। মস্তিকে শোণিত-প্রভাব অধিক হইলে রোগ, অল্প হইলেও রোগ, অধিক স্নিগ্ধতাও রোগ, অধিক রুক্ষতাও রোগ।

হ্রাসের বৃদ্ধি, বৃদ্ধির হ্রাস, সমতার বিধান, যে চিকিৎসার মূলভিত্তি; তাহা বিজ্ঞান সম্মত নয় কেন? কোন অশিক্ষিত লোকের মুখে জ্বরাদি কোন রোগের উৎপত্তি বিষয়ক রূপকে লিখিত শ্লোক-বিশেষের ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা ধৃষ্টতার কর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বৈদ্যক-চিকিৎসার সাষ্টাঙ্গ অনুসন্ধান কর, দেখিবে—শিক্ষা প্রদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অভাবেই ইহা অন্ধকার ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতিতেই কতকগুলি কুসংস্কারাপন্ন লোক আছেন। যে ইংরাজ জাতি আজ বিজ্ঞান লইয়া এত গরীয়ান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে কতদূর কুসংস্কার আছে, তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। একজন ইংরাজ সমাজ-লেখক বলেন—শিরোবেদনা রোগ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের এই কুসংস্কার আছে যে, মাথার চুল কাটিয়া যদি কেহ পথে ফেলিয়া দেয়, এবং একটী পাখী যদি সেই চুলের কয়েকটা মুখে করিয়া উড়িয়া যায়, তাহা হইলে ভয়ানক শিরোবেদনা হয়।

সসেক্স জিলার ইংরাজ কৃষকদিগের মধ্যে এই কুসংস্কারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। এই কুসংস্কারে বিশ্বাসী ইংরাজগণ মাথার চুল কাটিয়া তাহা অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া দিতে দেয় না।

কবিরাজ-শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির অন্তরায়।—পরশ্রীকাতরতাই যে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় জন্মাইয়া থাকে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য কথা। মিরজাফরের পরশ্রী-কাতরতার জন্যই সিরাজের সিংহাসন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, জয়চাঁদের পরশ্রী-কাতরতার ফলেই পৃথ্বিরাজের সিংহাসন মুসলমান করতলগত হয়,—দুর্য্যোধনের পরশ্রীকাতরতার জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সৃষ্টি। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারসাধনের জন্য দেশে নানারূপ আয়োজনের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সে আয়োজনের ভিতরও পরশ্রীকাতরতার স্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত। আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গগুলি লুপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই অঙ্গগুলির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র—এই অঙ্গগুলি লইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল মাত্র কায় চিকিৎসার কতকাংশ ভিন্ন আর সমস্ত অংশই বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। ঐ কায় চিকিৎসার যতটুকু লইয়া বর্ত্তমান সময়ে আমরা চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাও পূর্ণাবয়বযুক্ত নহে। এমতাবস্থায় দেশে পূর্ব্ববৎ আয়ুর্ব্বেদীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শল্য চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত দিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সেই চেষ্টাই করা হইতেছে। কিন্তু ইহার ভিতরও পরশ্রীকাতরতার বিদ্বেষবহ্নি ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমায় বিপ্লোৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। ইঙ্গীতে আমরা সামান্য আভাষ দিলাম মাত্র, ইহা হইতে যিনি যাহা বুঝিতে পারেন, বুঝিয়া লউন।

ডাক্তারি ও কবিরাজি।—চরক বলিয়াছেন,—"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগ্যায় কল্পতে। স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠ রোগেভ্যঃ যঃ প্রমচয়েৎ।" অর্থাৎ তাহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ,—যাহাতে রোগ প্রশমিত হয় এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক,—যিনি রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। কিন্তু এখনকার দিনে অনেক চিকিৎসকই এ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা না ভুলিলে বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তার এবং কবিরাজের মধ্যে বিপ্লব-বহ্নি উপস্থাপিত হইবে কেন? আমরা যখন শল্য চিকিৎসা এখন নিজেরা ভুলিয়া নিরক্ষর নাপিতের হাতে অর্পণ করিয়াছি, তখন শিক্ষিত ডাক্তার সম্প্রদায়কে অশ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে শস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষাপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত অঙ্গ পূরণ করিতে চেষ্টা করা সমধিক সঙ্গত নহে কি? আমাদের সুশ্রুত সংহিতায় সকলই আছে স্বীকার করি; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদত মাথার দিব্য দিয়াবলিয়াছেন,—শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, দৃষ্টকর্ম্মা না হইলে চিকিৎসক পদবাচ্য হইতেই পারিবে না। সুতরাং আমাদের লুপ্তরত্ন উদ্ধারের জন্য,—আমাদেরই শল্য-চিকিৎসা যাহা আমরা নিজেরা ভুলিয়া অপরকে প্রদান করিয়াছি,—স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য—তাঁহাদিগের নিকট তাহা গ্রহণান্তর আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পূর্ব্বভাবে আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে সকলে এ রহস্য বোঝেননা,—বা অন্তরে উপলব্ধি করিলেও মুখে ফুটিতে চাহেন না,—বা ফুটিলেও

স্বকীয় জেদ বজায় রাখার জন্য অন্তরূপ বুলি ধরিয়া থাকেন, সেই জন্যই এত কথা বলিলাম।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রের ভবিষ্যৎ।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে যে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—সেই পাঁচ বৎসর শিক্ষা-সমাপ্তির পর, উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এক একজন যে ধন্বন্তরি কল্প চিকিৎসক হইয়া দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করণে সমর্থ হইবে,—ইহা আমরা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি। এই উত্তীর্ণ ছাত্রগণই তখন একদিকে কায়চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখাইবে, অপর দিকে শস্ত্র-চিকিৎসার সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে। তখন শস্ত্রকরণ-উদ্দেশে যাঁহারা ডাক্তার দেখাইতে অভিলাষী—এই উত্তীর্ণ ছাত্র-গণের নিকট তাঁহারা নির্ভয়ে সে ভার প্রদানে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। কায়চিকিৎসার জন্য যাঁহারা সুশিক্ষিত কবিরাজ চাহেন, এই উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারা সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করিতে পারিবেন। এরূপ ব্যবস্থায় যুগপৎ মণিকাঞ্চনের সংযোগ সাধিত হইবে। বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরতো অতিবাহিতই হইল, আর চারি বৎসর পরে এই বিদ্যালয় কিরূপ সুফল প্রদান করিবে, তাহা দর্শন করিয়া চক্ষুর তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইবেন।

খাদ্যে ভেজাল।—তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি বিশুদ্ধ পাওয়া ক্রমশঃ দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে, সকল প্রকার দ্রব্যেই এখন 'ভেজা-লে'র পূর্ণ প্রচলন। এই 'ভেজাল' নিবারণের জন্য অবশ্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর আইনের বাঁধন আঁটিয়া রাখিয়াছেন,—কিন্তু সে বাঁধন এত আল্‌গা যে, তাহাতে ব্যবসায়ীরা ভেজাল চালাইবার আরও সুবিধা পাইতেছে। 'ভেজাল তৈল' 'ভেজাল ঘৃত' 'ভেজাল দুগ্ধ' প্রভৃতি কথা সাইন্ বোর্ডে লিখিয়া রাখিলে আর সে ব্যবসায়ীকে আইনের দায়ে পড়িতে হয় না ; কাজেই বাঁধনটা শক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই ভেজাল নিবারণের জন্য একটা আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইয়াছেন। সংপ্রতি মধ্য প্রদেশেরও গবর্ণ-মেণ্ট উহার নিবারণ কল্পে একটা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য ভারতগবর্ণ-মেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কলিকাতারমত সহরে এ আইনটার কিন্তু আর ও একটু কড়াকড়ি হওয়া কর্ত্তব্য। 'ভেজাল তৈল' 'ভেজাল ঘৃত' 'ভেজাল দুগ্ধ' প্রভৃতি দোকানের সাইনবোর্ডগুলি হইতে তুলিয়া দিয়া একেবারেই যাহাতে কোন ব্যবসায়ী ভেজাল দ্রব্য চালাইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। দেশবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে এজন্য অনুরোধ করিতেছি।

ধূমপান নিষেধ।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের সহ-কারী ডিরেকটার মিঃ এফ, সি, টার্ণার মহোদয় বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর স্কুল ও কলেজ সমূহের ছাত্রগণ যাহাতে ধূমপান করিতে না পায়—তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য সমস্ত স্কুল কলেজে এক একটি সারকুলার জারি করিয়াছেন। তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা বিদ্যালয় সান্নিধ্য স্থান সকল হইতে সিগারেট বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। ছাত্র দিগকে শিক্ষা-মন্দিরে বা বাহিরেও ধূমপান করিতে দিবেন না, তাঁহারা নিজেরা নিজেরাও বিদ্যা-মন্দিরে—অন্ততঃ পক্ষে ছাত্রদিগের সম্মুখে ও ধূমপান করিবেননা। তাঁহার আরও আদেশ—কোন ছাত্র প্রথম বার ধূমপানের অপরাধ করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু ২য় বারে তাহার দণ্ডবিধান করা হইবে। সকল প্রকার ধূমপানেই ছাত্র জীবনে অনিষ্ট হইয়া থাকে,—সিগারেটে ত সর্ব্বনাশ হয়ই। বর্ত্তমানে সিগারেটের অত্যধিক প্রচ-লনের জন্য দেশে অজীর্ণ এবং যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টার মহাশয় দেশের বালক মণ্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ যে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা।—শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ৮০নং হ্যারিসন রোডে শ্রীযুক্ত দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্নের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷৷০ টাকা। রমণীগণের গর্ভধারণের প্রথম হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত যে সকল নিয়মে থাকা কর্ত্তব্য, ঐ সময়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে যেরূপ ব্যবস্থায় তাহার প্রতি-বিধান করা যাইতে পারে, যেরূপ ব্যবস্থায় পাশকরা ধাত্রী বা ডাক্তার দিগের সাহায্য না লইয়া প্রসব-বাধা দূর করা যাইতে পারে,—এই পুস্তকে হর-পার্ব্বতীর কথোপকথন-চ্ছলে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সূতিকা রোগের ব্যবস্থা এবং শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে সকলেরই উপকার হইতে পারিবে।

হিন্দু পত্রিকা।—মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল। সহঃ সম্পাদক স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-তীর্থ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভারতী। যশোহর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ধর্ম্ম সাহিত্য এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য এ পত্রিকা-খানি ২৪ বর্ষ কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এবারে অনেকগুলি প্রবন্ধই গবেষণাপূর্ণ।

নব্য ভারত।—মাসিকপত্র ও সমালোচনা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। "নব্যভারত" আজ পয়ত্রিশ বৎসর কাল পরিচালিত হইতেছে,—ইহাই ইহার যোগ্যতার পরিচয়। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই ধর্ম্ম কথায় পূর্ণ,— বাজে অসার বিষয়ের আলোচনা ইহাতে নাই। এবারের সকল প্রবন্ধগুলিই মনোজ্ঞ হইয়াছে।

কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদনির্ণয় প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ।

কুষ্ঠও বাতরক্ত প্রবন্ধের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ১০মলাইনে যে ফুটনোট দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর এই কথাগুলি বসিবে।

> "জানুজঙ্ঘোরু কট্যংস হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু
> কণ্ডূ স্ফুরণ নিস্তোদ ভেদ গৌরব সুপ্ততাঃ
> ভূত্বা ভূত্বা প্রশাম্যন্তি কদাবাবির্ভবন্তি চ।"
> গরুড়পুরাণম্ পূর্ব্বখণ্ডম্—১৭১ অধ্যায়।

অর্থাৎ জানু, জঙ্ঘা, ঊরু, কটী, স্কন্ধ, হস্ত, পদ এবং শরীর সমূহে চুলকানি, স্পন্দন, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, বিদারণ, গুরুতাবোধ ও স্পর্শ শক্তির অভাব (এই সকল লক্ষণ) পুনঃ পুনঃ হইয়া প্রশমিত হয়, আবার কখনও আবির্ভূত হয়।

মূলের শব্দার্থ অনুসারে ইহা বাতরক্তের পূর্ব্বরূপ, কিন্তু স্বর্গীয় রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত দুইখানি গ্রন্থের অনুবাদেই ইহা বাতরক্তের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অর্থ টীকাকার সম্মত কিনা বলিতে পারি না তবে বাত-প্রধান রোগে লক্ষণসমূহের অনিয়তত্ব যুক্তিসঙ্গত বটে।

গরুড়পুরাণের এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্টে অনুমান হয়, লিপিকর প্রমাদ চরকসংহিতায় "নশ্যন্তি" স্থলে "নশ্যতি" পাঠও সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

ঐ প্রবন্ধে কুষ্ঠভেদক লক্ষণ সূচীতে "অঙ্গ পতন হয়" এ কথাটিও দেওয়া হয় নাই। অঙ্গ পতন হয় ইহার প্রমাণার্থ বাগ্‌ভট বলিয়াছেন, "বস্মাৎ কুষ্ণাতি তৎবপুঃ" অর্থাৎ অঙ্গপতন কারক বলিয়াই কুষ্ঠ নাম হইয়াছে।

বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

এবার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে বার্ষিক পরীক্ষায় শারীরবিজ্ঞান, অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যা বা অ্যানাটমী পদার্থবিদ্যা ও রসশাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা, দ্রব্যগুণ—এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। মোট ত্রিশটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্র-গণের নাম প্রকাশিত হইবে।

ভাদ্র মাসের সূচী।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাঃমাশুল সহ ৩।৶০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসের মধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা বা দুই কলম ৮৲, মাসিক আধ পৃষ্ঠা বা এক কলম ৪॥০, মাসিক সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম ২৸০, মাসিক অষ্টাংশ পৃষ্ঠা বা সিকি কলম ১॥০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। টাকা কড়ি এবং প্রবন্ধাদি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্-এ, এম্-বি, এই নামে এবং অন্যান্য পত্র এই ঠিকানায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।
আয়ুর্ব্বেদ কার্য্যাধ্যক্ষ।
২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও
১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।